বংশ-পরিচয়

(মহিলা-জীবনী)

প্রথম অংশ

নবম খণ্ড

প্রজাপতি-সম্পাদক

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার-সঙ্কলিত

প্রথম সংস্করণ

কলিকাতা ২০৯নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
৯নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, নিউ আর্য্য-মিশন প্রেসে
শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল দ্বারা
মুদ্রিত
ভাদ্র, ১৩৩৬

মূল্য ১৲ টাকা

ভারতবিশ্রুতকীর্ত্তি দানপুণ্য-সমুজ্জ্বল

কাশিমবাজার রাজবংশের

উজ্জ্বল গৌরব

পরহিতব্রত মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই

মহোদয়ের

সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী

পুণ্যশীলা **মহারাণী শ্রীযুক্তা কাশীশ্বরী** মহোদয়ার

অনুমতি অনুসারে

পুণ্যবতী মহিলাদিগের কীর্ত্তিকথাপূর্ণ

"বংশ পরিচয়" নবম খণ্ড

তাঁহার সুপবিত্র নামে উৎসর্গীকৃত হইল ।

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা

মহিলা-জীবনী
দ্বিতীয় অংশ
যন্ত্রস্থ

বংশ-পরিচয়

নবম খণ্ড

সতী

ভারতীয় আর্য্যমহিলাগণের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে হইলে সর্ব্ব-প্রথমে সতীর কথা লিখিতে হয়। পূর্ব্বকালে ভৃগুনামে এক ঋষি ছিলেন, কোন সময়ে তিনি এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। দেবগণ, ঋষিগণ, প্রজাপতিগণ সকলে সেই যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। দক্ষরাজ সেই যজ্ঞে উপস্থিত হইবামাত্র সকলে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন, কেবল আপনভাবে বিভোর মহাদেব বসিয়া রহিলেন। দক্ষ ইহাতে মহাদেবকে নানা প্রকার কটু ভাষায় তিরস্কার করিলেন। দক্ষের তিরস্কারে কিন্তু মহাদেব বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না, তিনি উচ্চবাচ্য করিলেন না। কিছুদিন পরে দক্ষ নিজে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন, সেই যজ্ঞে ত্রিভুবনের সকলেই নিমন্ত্রিত হইলেন, কেবল নিমন্ত্রিত হইলেন না মহাদেব ও সতী। দক্ষ নারদের উপর নিমন্ত্রণের ভার দিলেন। নারদ কিন্তু চুপি চুপি গিয়া সতীকে দক্ষযজ্ঞের সংবাদ দিয়া আসিলেন। সতী পিতৃযজ্ঞে যাইবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। মহাদেব তাঁহাকে অনেক প্রকারে নিষেধ করিলেন; কিন্তু সতী সে কথা শুনিলেন না। অগত্যা মহাদেব তাঁহাকে অনুমতি দিলেন। সতী ভূত-প্রেত-পিশাচগণকে সঙ্গে লইয়া দক্ষযজ্ঞে যাইলেন।

সতী গিয়া দেখিলেন, দক্ষযজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে, দেবগণ, ঋষিবৃন্দ

সকলে এবং সতীর মাতা, ভগিনী প্রভৃতি সকলে সে যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছেন। সতীর মাতা ও ভগিনীগণ তাঁহাকে পরম সমাদরে বসাইলেন, কিন্তু দক্ষ কোন কথা বলিলেন না। পরন্তু মহাদেবের নানা প্রকার নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। স্বামীর নিন্দাবাদ সতীর প্রাণে সহ্য হইল না। সতী বলিলেন, "পিতঃ! আমার স্বামী নিন্দা ও স্তুতির অতীত, তিনি রাগ ও দ্বেষের বহির্ভূত, তিনি আপনার আনন্দে আপনি বিভোর, শুধু শুধুই তাঁহার নিন্দা করিতেছ কেন? কিন্তু আমি তোমার কন্যা, তোমা হইতে এই দেহ লাভ করিয়াছি, আমি এই দেহ লইয়া আর সেই দেবগণবাঞ্ছিত স্বামীর চরণ স্পর্শ করিব না, এই স্থানেই এই দেহের অবসান করিব এবং দেহমুক্ত হইয়া তাঁহার সেবা করিব।" এই বলিয়া সতী সেইখানেই যোগাসনে বসিয়া দেহত্যাগ করিলেন।

এই সংবাদ মহাদেবের কর্ণগোচর হইবামাত্র ভূত-পিশাচগণ দক্ষযজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করিয়া দিল এবং দক্ষের প্রাণ বিনাশ করিল। দক্ষপত্নীর অনুরোধে মহাদেব দক্ষের কবন্ধে একটি ছাগমুণ্ড সংযোজিত করিয়া তাহাতে প্রাণদান করিলেন। ছাগমুণ্ড দক্ষ বাঁচিয়া উঠিল।

এদিকে মহাদেব সতীর দেহ স্কন্ধে করিয়া ত্রিভুবন পর্য্যটন করিলেন। সৃষ্টিরক্ষার জন্য বিষ্ণু সুদর্শনচক্রে শিবের স্কন্ধে বাহিত সতীর দেহ খণ্ড বিখণ্ড করিয়া তাহা নানা স্থানে নিক্ষেপ করিলেন। যেসমস্ত স্থানে সতীর দেহের অংশসমূহ পতিত হইল, সেইসমস্ত স্থান এক একটি তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। এইভাবে সতীর দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মহাদেব মহাযোগে বসেন।

এদিকে সতী দেহত্যাগের পর পুনরায় হিমাচল-রাজের কন্যা উমারূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং বহুদিন ধরিয়া যোগে নিমগ্ন মহাদেবের তপস্যা করিয়া পুনরায় তাঁহাকে পতিরূপে লাভ করেন।

সীতাদেবী

বিহার প্রদেশের উত্তরভাগে ত্রিহুত নামে একটি স্থান আছে, পূর্ব্বে ঐ স্থানকে লোকে মিথিলা বা বিদেহ বলিত। সেই মিথিলায় জনক নামে এক চন্দ্রবংশীয় রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি রাজা হইলেও ভোগ-বিলাসে দিন না কাটাইয়া ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিতেন। কথিত আছে, এক দিন তিনি নিজ হস্তে লাঙ্গল চষিতে চষিতে একটি কন্যা পান, সেই কন্যাটিকে তিনি নিজের কন্যার ন্যায় লালন-পালন করিতে থাকেন। জনক রাজার কন্যা বলিয়া অনেকে সীতাকে 'জানকী' বলিয়াও অভিহিত করিতেন। রাজা জনকের ঘরে মহাদেব-প্রদত্ত একটি বিশাল ধনু ছিল। জনক পণ করিয়াছিলেন যে, যে বীর এই ধনুকে 'গুণ' পরাইতে পারিবেন, সেই বীরের সহিত তিনি সীতার বিবাহ দিবেন। তখন স্বয়ম্বরপ্রথা ছিল। রাজর্ষি জনকের আমন্ত্রণে নানা দেশ হইতে বড় বড় বীর সীতাকে লাভ করিবার জন্য মিথিলায় আসিলেন, কিন্তু কেহই ধনুকে 'গুণ' পরাইতে পারিলেন না। সেই সভায় ঋষি বিশ্বামিত্র অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র রামলক্ষ্মণকে আনিয়াছিলেন, রামচন্দ্র অনায়াসে ধনুকখানি ভাঙ্গিয়া দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। তখন রামচন্দ্রের সহিত সীতার, জনকের আপন ঔরস-জাত কন্যা উর্ম্মিলার সহিত লক্ষ্মণের এবং জনকের ভ্রাতা কুশধ্বজের কন্যা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তির সহিত যথাক্রমে ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহ হইল।

বিবাহান্তে সীতা ও তাঁহার ভগিনীগণ স্ব স্ব স্বামী ও শ্বশুর রাজা দশরথ-সমভিব্যবহারে অযোধ্যায় আসিলেন। কিছু দিন অযোধ্যার রাজপুরীতে তাঁহাদের দিন বেশ সুখে কাটিল। রাজা দশরথ বৃদ্ধ

হওয়ায় জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। রাজ্যময় অভিষেকের আয়োজন চলিতে লাগিল; নগরসকল আলোকমালায় সুশোভিত হইল। কিন্তু অভিষেকের দিন যখন রাজা দশরথ অভিষেক-সভায় মধ্যমা মহিষী কৈকেয়ীকে না দেখিয়া তাঁহার সন্ধানে অন্তঃপুরে যাইলেন, তখন যাইয়া দেখিলেন, কৈকেয়ী আলুলায়িতকেশে ক্রোধাগারে পড়িয়া রহিয়াছেন। কৈকেয়ীর মন্থরা নাম্নী একটি ক্রূরপ্রকৃতি দাসী ছিল, সে কৈকেয়ীকে এই মন্ত্রণা দিয়াছিল যে, রামচন্দ্র রাজা হইলে রাজমহিষী কৌশল্য হইবেন "রাজমাতা"; অতএব কলে কৌশলে রামচন্দ্রকে বনে পাঠাইতে পারিলে সকল গোল মিটিয়া যায়। পূর্ব্বে কোন অসুরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া রাজা দশরথ গুরুতররূপে আহত হন, সেই সময় কৈকেয়ী রাজা দশরথের যথেষ্ট সেবা-শুশ্রূষা করেন। তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দশরথ তাঁহাকে দুইটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হন, কৈকেয়ী তখন সেই বর না লইয়া প্রয়োজনমত লইবেন বলিয়াছিলেন। এখন মন্থরার পরামর্শে তিনি দশরথকে সম্মুখে দেখিয়া সেই দুইটি বর প্রার্থনা করিলেন এবং এক বরে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য রামচন্দ্রের জটাবল্কল পরিয়া বনবাস এবং অন্য বরে অযোধ্যার সিংহাসনে স্বীয় পুত্র ভরতকে স্থাপন—এই দুইটি বর প্রার্থনা করিলেন। রাজা দশরথ এই নির্ম্মম, নি[illegible]র প্রস্তাব শুনিয়া ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। এদিকে রামচন্দ্র রাজসভায় পিতার ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়াও কৈকেয়ীর মহলে গিয়া পিতার ঐরূপ অর্দ্ধমৃত অবস্থা দেখিয়া কৈকেয়ীকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কৈকেয়ী তখন রামচন্দ্রকে প্রাগুক্ত বর দুইটির কথা বলিলেন। রামচন্দ্র তাহা শুনিয়া সহাস্য আস্যে বলিলেন, "বেশ ত, পিতার সত্যপালনের জন্য আমি আজই বনে যাইতেছি।" এই বলিয়া রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ অভি-

যেকোপযোগী বেশ পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। লক্ষ্মণ তাহা শুনিয়া রামের অনুগামী হইতে ইচ্ছা জানাইলেন। সীতাদেবী কোনক্রমে পতিহারা হইয়া রাজপ্রাসাদে থাকিতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "তুমি আমার স্বামী, তুমি যেখানে থাকিবে তাহা গহন বন হইলেও আমার নিকট স্বর্গতুল্য। তোমার দেহ যখন পথশ্রান্তিতে ক্লান্ত হইবে, তখন আমি তোমাকে বীজন করিয়া নারীজীবনের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিব—তোমাকে ছাড়িয়া অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ আমার নিকট বিষতুল্য—বিশুষ্ক মরুভূমি।"

কৌশল্যা ও সুমিত্রার নিকট বিদায় লইয়া সুমন্ত্র সারথির সহিত রাম, লক্ষ্মণ, সীতা প্রথমে চিত্রকূট পর্ব্বতে আসিলেন। তাঁহারা যে সময় অযোধ্যা হইতে যাত্রা করেন, সে সময় ভরত নন্দীগ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে ছিলেন। তিনি অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন, রাজা দশরথ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন এবং রাম, লক্ষ্মণ, সীতা বনে গিয়াছেন। শোকে, দুঃখে, লজ্জায় ভরত আর কালবিলম্ব না করিয়া চিত্রকূটে উপস্থিত হইলেন; রাম-লক্ষ্মণ ও সীতাকে অযোধ্যায় ফিরিবার জন্য কত অনুরোধ করিলেন কিন্তু রামচন্দ্র বলিলেন, "পিতৃ-সত্যপালন না হইলে আমি কখনও দেশে ফিরিব না।" ভরত অগত্যা রামচন্দ্রের কাষ্ঠপাদুকা লইয়া নন্দীগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন এবং সিংহাসনের উপর তাহা স্থাপন করিয়া রামচন্দ্রের নামে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

এদিকে চিত্রকূট হইতে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা গোদাবরী-নদীতটে পঞ্চবটী বনে উপস্থিত হইলেন। পঞ্চবটীর নৈসর্গিক শোভাসম্পদ দর্শন করিয়া সীতাদেবী পরম পুলকিতা হইলেন। রাজহংসের সহিত তিনি গোদাবরী-সলিলে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন; কুরঙ্গ-কুরঙ্গিণীগণের সহিত তিনি নিত্য ক্রীড়া করিতেন। এইভাবে কিছু দিন যাইলে একদিন

লঙ্কাধিপতি রাক্ষসরাজ রাবণের ভগিনী সূর্পণখা আসিয়া লক্ষ্মণকে বিবাহ করিতে বলে। লক্ষ্মণ তাহার নাক-কান কাটিয়া দেন। ইহাতে সূর্পণখা ক্রোধে আত্মহারা হইয়া লঙ্কায় গিয়া অগ্রজ রাবণের নিকট অভিযোগ করে। তখন রাবণের আদেশে মারীচ নামে এক রাক্ষস মায়ামৃগ সাজিয়া পঞ্চবটী বনে রামচন্দ্রের আশ্রমের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। সীতাদেবী সেই মায়ামৃগ ধরিয়া দিবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করিলেন। কপট মৃগ এক গহনবনে গিয়া "কোথা রে ভাই লক্ষ্মণ" বলিয়া চীৎকার করিল। সীতা সেই স্বর শুনিয়া রামচন্দ্রকে রক্ষা করিবার জন্য লক্ষ্মণকে প্রেরণ করিলেন। লক্ষ্মণ প্রথমে যাইতে সম্মত না হইলে সীতাদেবীর ভর্ৎসনায় তাঁহাকে যাইতে হয়। ইত্যবসরে যোগীর ছদ্মবেশে দুষ্ট রাবণ সীতাদেবীকে একাকিনী পাইয়া তাঁহাকে বিমানে তুলিয়া লঙ্কায় লইয়া যায় এবং অশোক বনে রাখে। সীতাদেবী রাবণের ভয়ে বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া স্পষ্টতঃ তাহাকে বলেন যে তাঁহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিলেও তিনি রাম ভিন্ন অন্য কাহাকেও হৃদয়ে স্থান দিবেন না। সীতার কথায় রাবণ তৎপ্রতি কুপিত হইয়া নারীরক্ষীদিগের দ্বারা তাঁহার প্রতি অসীম অত্যাচার করিতে থাকেন।

এদিকে সীতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে রাম-লক্ষ্মণ ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে উপস্থিত হন। তথায় সুগ্রীব নামক বানর-রাজের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়, সুগ্রীব তাঁহাকে সীতা উদ্ধার করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হওয়ায় রামচন্দ্র বালিকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে কিস্কিন্ধ্যার সিংহাসনে বসান। অতঃপর হনুমান লঙ্কায় গিয়া সীতার সংবাদ লইয়া আসেন এবং বানরগণের সহায়তায় রামচন্দ্র সমুদ্র বন্ধন করিয়া লঙ্কায় উপনীত হন। রামচন্দ্রের সৈন্যগণে ও রাবণের সৈন্যগণে বহুদিনব্যাপী তুমুল যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে রাবণকে সবংশে নিধন করিয়া রামচন্দ্র সীতা উদ্ধার করেন।

সীতা রাবণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ থাকিয়াও সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছেন কি না, ইহা সর্ব্বজনসমক্ষে পরীক্ষার জন্য সীতাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিতে বলা হয়। সীতাদেবী বলেন, "যদি আমি মনে প্রাণে রামচন্দ্র ভিন্ন অন্য পুরুষের চিন্তাও না করিয়া থাকি, তাহা হইলে অগ্নি আমাকে স্পর্শও করিবে না।" সত্যও হইল তাহাই। প্রজ্জ্বলিত হুতাশন নিস্তেজ হইল, যেমন সীতা তেমনই অগ্নির ভিতর হইতে বাহির হইলেন। রামচন্দ্র বিভীষণকে লঙ্কার রাজপদে প্রতিষ্ঠা করিয়া লক্ষ্মণ ও সীতাকে লইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং ভরতের হাত হইতে রাজদণ্ড লইয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু নানা জনে সীতা-চরিত্রে কলঙ্কের আরোপ করিতে লাগিল। বলিতে লাগিল, দশানন রাবণের পুরীতে অবরুদ্ধ থাকিয়া সীতা নিশ্চয়ই আপন সতীত্ব রক্ষা করিতে পারেন নাই। প্রজাগণের মনোবাঞ্ছা পরিপূরণের জন্য অগত্যা শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে বনবাসে পাঠাইতে সঙ্কল্প করিলেন। সীতাদেবী তখন পাঁচ মাসের গর্ভবতী। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের আদেশে সীতাকে তপোবন দেখাইবার ছলে বাল্মিকীর তপোবনে নির্ব্বাসিতা করিয়া আসিলেন। সীতা লক্ষ্মণের মুখে নিজের নির্ব্বাসনের বার্ত্তা শুনিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, "লক্ষ্মণ! তুমি আর্য্যপুত্রকে (রামচন্দ্রকে) বলিও, আমি তাঁহার প্রতি একটুও অসন্তুষ্ট হই নাই, সবই আমার অদৃষ্টের দোষ।"

অতঃপর সীতার রোদন শুনিয়া বাল্মিকী আসিয়া সীতাকে লইয়া যাইলেন। বাল্মিকীর আশ্রমে সীতা লালিত-পালিত হইতে লাগিলেন। তথায় তাঁহার কুশ ও লব নামে দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। বাল্মিকী রাম-সীতার কাহিনীপূর্ণ "রামায়ণ" নামক মহাকাব্য লিখিয়া কুশ ও লবকে তাহা শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

এদিকে রামচন্দ্র এক অশ্বমেধযজ্ঞের আয়োজন করিলেন। সস্ত্রীক না হইলে যজ্ঞ সমাপন হয় না বলিয়া তিনি পুনরায় বিবাহ না করিয়া সীতার এক স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া সেই প্রতিমাসহ যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। সেই যজ্ঞে কুশ ও লব আসিয়া সর্ব্বজনসমক্ষে রামায়ণ গান করিলেন। কুশ-লবের মুখে সীতার দুঃখের কথা শুনিয়া তিনি পুনরায় সীতাকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। সীতাকে রাজসভায় আনা হইল। তখন প্রজাগণের মনস্তুষ্টির জন্য রামচন্দ্র তাঁহাকে তাঁহার নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে শপথ করিতে বলিলেন। সীতা বড় আশা করিয়া অযোধ্যায় আসিয়াছিলেন, রামচন্দ্রের এই কথায় তিনি মনে বড় ব্যথা পাইলেন। তাঁহার আর বাঁচিতে সাধ হইল না ; তিনি মাতা বসুন্ধরাকে কোলে লইবার জন্য বলিলেন। তৎক্ষণাৎ সীতার পদতলে ধরণীবক্ষ বিদীর্ণ হইল ; জনমদুঃখিনী সীতা ধরিত্রীর কোলে অন্তর্হিতা হইলেন।

কুন্তী

পাণ্ডব-জননী কুন্তী যদুবংশীয় রাজা শূরসেনের কন্যা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের ভগিনী। কুন্তীর যথার্থ নাম পৃথা। শূরসেন পৃথাকে তাঁহার বন্ধু রাজা কুন্তীভোজকে দান করেন এবং কুন্তীভোজ আপন কন্যার ন্যায় পৃথাকে লালিত-পালিত করেন। এইজন্য পরে তাঁহার নাম হয় কুন্তী। রাজা কুন্তীভোজের সন্তানাদি ছিল না।

এই সময়ে কুরুবংশীয় রাজগণ ভারতবর্ষের রাজা ছিলেন, বর্ত্তমান দিল্লীর নিকট হস্তিনাপুরে তাঁহাদের রাজ্য ছিল। কুরুবংশের রাজা পাণ্ডুর সহিত কুন্তীর বিবাহ হয়। স্বয়ম্বরে কুন্তী পাণ্ডুর গলদেশেই মাল্য প্রদান করেন। পাণ্ডুর এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল ধৃতরাষ্ট্র। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলিয়া কনিষ্ঠ পাণ্ডুই সিংহাসন লাভ করেন। কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন জন্ম গ্রহণ করেন, আর কুন্তীর সপত্নী মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব নামে দুই যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। এদিকে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গান্ধারীর গর্ভে তাঁহার দুঃশাসন-প্রমুখ এক শত সন্তান জন্মগ্রহণ করে। পাণ্ডুর পুত্রগণ পাণ্ডব এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ কৌরব নামে খ্যাত হয়।

রাজা পাণ্ডু শিশুপুত্রদিগকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন, মাদ্রীও পাণ্ডুর সহিত সহমরণে যান। তখন কুন্তী নকুল-সহদেবকে আপন পুত্রের ন্যায় লালন-পালন করিতে থাকেন, তাঁহার অপরিসীম স্নেহ ও যত্নে নকুল-সহদেব এক দিনের জন্যও বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহারা মাতৃহারা হইয়াছেন।

যুধিষ্ঠির বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। কিন্তু ইহাতে ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধনাদি

পুত্রগণ হিংসার আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিল। দুর্য্যোধন কুন্তীসহ পাণ্ডবগণকে কেমন করিয়া বিনাশ করিবেন, নিশিদিন তাহা ভাবিতে লাগিলেন। একদিন দুর্য্যোধন বারবাণতে গালা ও নানারূপ দাহ্য পদার্থ দিয়া একটি জতুগৃহ নির্ম্মাণ করিল, ধৃতরাষ্ট্র আপন পুত্রদের অভিসন্ধি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কুন্তীসহ পাণ্ডবগণকে বারবাণতে যাইতে আদেশ করিলেন। এক নিষাদ পরিবারের পাচ জনও তাঁহাদের ন্যায় ঐ জতুগৃহে আশ্রয় লইয়াছিল। যুধিষ্ঠির সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া দুর্য্যোধনের চক্রান্ত বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ মাতা ও ভ্রাতাগণসহ বাহির হইয়া চলিয়া আসিলেন। প্রাতঃকালে দুর্য্যোধন প্রভৃতি সেই নিষাদ পরিবারের পাঁচজনের ভস্মীভূত কঙ্কাল দেখিয়া মনে করিল, পাণ্ডবগণ নিশ্চয়ই মারা গিয়াছে।

পাণ্ডবগণ আর গৃহে না ফিরিয়া ছদ্মবেশে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে একচক্রা নামক এক নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এক ব্রাহ্মণের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহারা অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই গ্রামে বকরাক্ষস নামে এক মহাবল-পরাক্রান্ত রাক্ষস বাস করিত। সেই রাক্ষসের আহারের নিমিত্ত গ্রামের প্রত্যেক পরিবার হইতে এক একটি লোককে পর্য্যায়ক্রমে পাঠাইতে হইত। এক-দিন যুধিষ্ঠিরাদি চারিভ্রাতা আহার্য্যের সন্ধানে বাহির হইয়াছে, কুন্তী ও ভীম ঘরে আছেন। এমন সময়ে ব্রাহ্মণের গৃহে ক্রন্দনের কলরব উঠিল। কুন্তী জিজ্ঞাসায় জানিলেন, আজ ব্রাহ্মণ পরিবারের মধ্যে একজনের যাইবার পালা। ইহা শুনিয়া কুন্তী ব্রাহ্মণ পরিবারকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,"আজ আমি রাক্ষসের নিকট আমার পুত্রকে পাঠাইতেছি, আপনারা নিশ্চিন্ত হউন।" এদিকে যুধিষ্ঠিরাদি ঘরে ফিরিলে কুন্তী ভীমকে বকরাক্ষসের নিকট পাঠাইয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কুন্তী বলিলেন, "বাবা! বিপন্ন ব্রাহ্মণকে রক্ষা

করার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের পক্ষে আর কি আছে? এই ব্রাহ্মণ পরিবার আমাদিগকে আশ্রয় দান করিয়াছেন, আশ্রয়দাতার উপকার করা কি উচিত নহে? ক্ষত্রিয় যদি ক্ষত্রোচিত ধর্ম্মপালনের জন্য মারাও যায়, তাহা হইলেও তাহাতে পৌরুষ আছে।" যুধিষ্ঠির আর কোন কথা বলিলেন না। এদিকে বীরবর বৃকোদর বকরাক্ষসকে বধ করিয়া বিজয়োল্লাসে ফিরিয়া আসিয়া মাতৃপদে প্রণাম করিলেন।

অতঃপর ব্রাহ্মণের গৃহে আরও কিছুকাল অবস্থান করিয়া তাঁহারা ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে পাঞ্চালদেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় অর্জ্জুন একটি চক্রের ছিদ্রপথ দিয়া লক্ষ্য ভেদ করিয়া পাঞ্চালতনয়া দ্রৌপদীকে লাভ করেন। দ্রৌপদীকে লইয়া পাঁচ ভাই যখন কুন্তী-সমীপে আগমন করেন, তখন কুন্তী গৃহমধ্যে গৃহকার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। বাহির হইতে পঞ্চ ভ্রাতা সোল্লাসে বলিলেন, "মা! আজ আমরা এক অপূর্ব্ব রত্ন আনিয়াছি।" কুন্তী তাহা শুনিয়া গৃহ মধ্য হইতে বলিলেন, "পাঁচ ভাইয়ে ভাগ করিয়া লও।" মায়ের আদেশে পঞ্চ ভ্রাতাই দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন।

অতঃপর ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বানে পাণ্ডবগণ স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন, ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য দুই ভাগে ভাগ করিয়া দিলেন, এক ভাগ লইয়া দুর্য্যোধন হস্তিনাপুরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন, আর যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিয়া তথা হইতে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। এক্ষণে যেখানে দিল্লী অবস্থিত, সেইখানে পূর্ব্বে ইন্দ্রপ্রস্থ ছিল।

কিছুকাল বেশ সুখেই কাটিল। যুধিষ্ঠির দিগ্বিজয় করিয়া এক রাজসূয়-যজ্ঞ সমাপন করিলেন। ইহাতে দুর্য্যোধন ঈর্ষ্যানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিল। দুর্য্যোধনের পরামর্শে শকুনি যুধিষ্ঠিরকে পাশাখেলায় পরাভূত করিয়া দ্বাদশ বৎসরের জন্য তাঁহাকে বনবাসে এবং এক বৎসরের জন্য অজ্ঞাতবাসে পাঠাইলেন। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ

ভ্রাতা দ্বাদশ বৎসরের জন্য বনবাস করিতে বাধ্য হইলেন। কুন্তী সানন্দচিত্তে পুত্রগণকে পণরক্ষার অনুমতি দিলেন। দ্রৌপদী ও পাণ্ডু পুত্রগণের সহিত বনে চলিলেন

দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিয়া ফিরিয়া আসিবার পরও দুর্যোধন বিনা যুদ্ধে তাঁহাদিগকে সূচ্যগ্র মেদিনী দিবেন না বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দূতরূপে গিয়া দুর্যোধনকে কত অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও দুর্যোধন সম্মত হইলেন না। কুন্তীর অভিপ্রায় জানিতে গেলে কুন্তী শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, "আমার পুত্রগণ যে সভামধ্যে দ্রৌপদীর অপমান সহ্য করিয়া ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম ভুলিয়া এখনও দুর্যোধনের তোষামোদ করিতেছে, ইহাতে আমি যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়াছি। তাহারা কি যুদ্ধ করিয়া মায়ের পরাধীনতা দূর করিতে পারে না?" কুন্তীর এই কথা শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট বলিলেন। মাতৃবাক্য স্মরণ করিয়া পাঁচ ভাই সেই শত কৌরবের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন।

কুরুক্ষেত্রে উভয় দলে ভীষণ যুদ্ধ হইল। কৌরব পক্ষে বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র, কৌরব-মহিষী গান্ধারী ও দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ব্যতীত সেই যুদ্ধে আর সকলেই নিহত হইল। কুন্তীদেবী আপন পুত্রগণের বিজয়-লাভে আনন্দিত হইলেও আত্মীয়-স্বজনবধে নিরতিশয় দুঃখিতা হইলেন। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের চক্ষুর জল ও গান্ধারীর দীর্ঘশ্বাস সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী উভয়ে বনগমন করিলেন, কুন্তীও তাঁহাদের সেবা করিবার জন্য বনে চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে বনে যাইতে দেখিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন, "মা! যখন আমাদের দুঃখের সময় ছিল তখন তুমি সংসারে থাকিলে, আর আজ সুখের দিনে রাজ্য-সংসার ছাড়িয়া বনে যাইতেছ কেন? যদি এই ভাবে বনে যাইবে, তাহা হইলে যুদ্ধ করিবার

জন্য আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলে কেন?" কুন্তী বলিলেন, "আমি রাজ্যসুখ ভোগ করিবার জন্য তোমাদিগকে যুদ্ধ করিতে বলি নাই। দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার প্রতীকার করিবার জন্য এবং ক্ষত্রিয় হইয়াও তোমরা দীনহীনের জন্য রাজ্য ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছ—ইহা দেখিয়া তোমাদিগকে যুদ্ধ করিতে বলিয়াছিলাম। আমার আর রাজ্য-ধন ও সুখৈশ্বর্য্যে স্পৃহা নাই। বনে গিয়া তপস্যা করিব এবং তোমার জ্যেষ্ঠতাত ও জ্যেষ্ঠতাত-পত্নী গান্ধারীর সেবা করিব, ইহাই স্থির করিয়াছি।"

যুধিষ্ঠির আর কোন আপত্তি করিলেন না। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সহিত কুন্তী বনে চলিয়া গেলেন।

গান্ধারী

কৌরবদিগের জননী গান্ধারী গান্ধারদেশের রাজা সুবলের কন্যা ছিলেন। বর্ত্তমান কান্দাহার দেশ প্রাচীন গান্ধার—ইহা অনেকে অনুমান করেন। জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সহিত যদিও তাঁহার বিবাহ হয়, তথাচ তিনি কখনও ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতেন না। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক সময় দুর্য্যোধনাদির অনেক অন্যায় কার্য্যেও উৎসাহ প্রদান করিতেন, কিন্তু গান্ধারী তাহা করিতেন না। দুর্য্যোধনাদি যখন দ্রৌপদীকে রাজসভায় আনিয়া তাঁহার প্রতি অমানুষিক লাঞ্ছনা করিতে থাকেন, সেই সংবাদ গান্ধারীর কর্ণ-গোচর হইবামাত্র তিনি অন্তঃপুর হইতে রাজসভায় চলিয়া আইসেন এবং দুর্য্যোধনকে অনেক ভর্ৎসনা করিয়া নারীলাঞ্ছনা হইতে নিবৃত্ত করেন।

গান্ধারীর ভ্রাতা দুষ্টমতি শকুনি যখন কপট দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিয়া বনবাসে দেন, তখন গান্ধারী আসিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, "মহারাজ! আপনি পুত্রস্নেহ-প্রসূত দুর্ব্বলতাবশতঃ এ কি ঘোর অন্যায় করিতেছেন! যে পুত্র পিতার কথা শুনে না, সেরূপ দুর্ব্বিনীত পুত্রকে বর্জ্জন করা কি সঙ্গত নহে?" পুত্রমোহান্ধ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর পরামর্শ শুনেন নাই বটে, কিন্তু ইহাতে গান্ধারীর যে মহত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছে, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে?

গান্ধারীর মত কয়জন জননী নিজ দুষ্ট পুত্রদিগকে বর্জ্জন করিবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করিতে পারে?

বনবাস হইতে প্রত্যাগমনের পর শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি পাণ্ডবদিগকে রাজ্যের অর্দ্ধাংশ দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন,

কিন্তু দুর্য্যোধনের অনুরোধে ধৃতরাষ্ট্র তাহাতে কোন মতে সম্মত হইলেন না। তখন গান্ধারী নিজে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "রাজা! তুমি পাপিষ্ঠ পুত্রদের কথামত এ কি অন্যায় কাজ করিতেছ? কেন শান্তির স্থলে অশান্তি আনয়ন করিতেছ?" দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়াও তিনি বলিলেন, "বৎস! যদি মা বলিয়া আমার প্রতি তোমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাভক্তি থাকে, তাহা হইলে আজই যুধিষ্ঠিরকে অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান কর, আর আপনাআপনির মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া কুলক্ষয়ের পথ পরিষ্কার করিও না।" দুর্য্যোধনও গান্ধারীর কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ফলে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ বাধিল। দীর্ঘ অষ্টাদশদিবসব্যাপী যুদ্ধে কুরুকুল নির্ম্মূল হইল। প্রতিদিন যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে দুর্য্যোধন যখন গান্ধারীকে প্রণাম করিতে যাইতেন, তখন গান্ধারী তাঁহাকে বলিতেন, "পুত্র! জানিও যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই জয়।" যুদ্ধান্তে পুত্রগণকে হারাইয়া গান্ধারী উন্মত্তাপ্রায় হইলেও পাণ্ডবগণকে অভিশাপ প্রদান করিলেন না। পাণ্ডবগণকে কোলে লইয়া বলিলেন, "আমার শত পুত্র গিয়াছে, এখনও ত পাঁচটি পুত্র আছে।" যুদ্ধান্তে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গান্ধারী রণক্ষেত্রে গিয়া পুত্রগণের রুধিরাক্ত দেহ ও ছিন্নমুণ্ড দেখিয়া বিলাপ করিতে থাকেন এবং বলেন, "এই দৃশ্য আজ আমাকে দেখিতে হইবে বলিয়াই আমি ভূয়োভূয়ঃ দুর্য্যোধনকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম।"

অতঃপর গান্ধারী অন্ধপতি ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বনগমন করেন। সেই বনে অকস্মাৎ দাবানল উপস্থিত হওয়ায় ধৃতরাষ্ট্র ও কুন্তীর সহিত গান্ধারীও ভস্মীভূত হন।

দ্রৌপদী

আমরা প্রাতঃকালে নিদ্রোত্থিত হইয়া যে পঞ্চ সতীর নাম করি, তাঁহাদের মধ্যে দ্রৌপদী অন্যতমা। পাঞ্চালদেশের রাজা দ্রুপদের কন্যা বলিয়া তাঁহার নাম দ্রৌপদী। তাঁহার প্রকৃত নাম কিন্তু কৃষ্ণা। ছদ্মবেশে থাকার কালে অর্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়া আনেন এবং পাঁচ ভাইয়ে কুটীরের প্রাঙ্গণ হইতে কুন্তীকে বলেন, "মা আমরা আজ এক অমূল্য রত্ন আনিয়াছি।" কুন্তী সেই কথা শুনিয়া বলেন, "তোমরা পাঁচ ভাইয়ে তাহা ভাগ করিয়া লও।" মায়ের আদেশ পালনের জন্য পাঁচ ভাই-ই দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন। দ্রৌপদী পাঁচ ভাইকেই সমান চক্ষে দেখিতেন। একবার যুধিষ্ঠির যখন দ্রৌপদীর ঘরে থাকেন, তখন অর্জুন কোন বিশিষ্ট রাজকার্য্যে সেই ঘরে যান, তজ্জন্য নিয়ম ভঙ্গ করার অপরাধে অর্জুনকে দ্বাদশ বৎসরের জন্য বনবাসে যাইতে হয়। বনবাসে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাকে বিবাহ করিয়া লইয়া আসেন। দ্রৌপদী সুভদ্রাকে এরূপ যত্নে ও সমাদরে রাখিয়াছিলেন যে, সুভদ্রা একদিনের জন্যও বুঝিতে পারে নাই যে, দ্রৌপদী তাঁহার সপত্নী। অতঃপর কূটবুদ্ধি শকুনির সহিত পণ রাখিয়া পাশা খেলিতে গিয়া যুধিষ্ঠির একে একে রাজ্য-ধন হারাইলেন; অবশেষে দ্রৌপদীকে পণ রাখিলেন; দ্রৌপদীকেও হারিলেন। তখন প্রতিহারী গিয়া দুর্য্যোধনের আদেশমত রজস্বলা দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনিতে গেল। দ্রৌপদী রাজসভা হইতে দূরে দাঁড়াইয়া প্রতিহারীকে দিয়া দুর্য্যোধনকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, "আমি যখন একজনের স্ত্রী নহি, তখন যুধিষ্ঠির একাকী আমাকে পণ রাখিতে পারেন না। আর যুধিষ্ঠির প্রথমবারের পণ-রক্ষাতেই ত দুর্য্যোধনের দাস হইয়াছেন, সুতরাং আমাকে তিনি পণ রাখেন কোন্ অধিকারে?"

প্রতিহারী গিয়া দুর্য্যোধনের নিকট দ্রৌপদীর কথা বলিলেন। দুর্য্যোধন এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। দুর্য্যোধনের পুনঃ পুনঃ আহ্বান সত্ত্বেও দ্রৌপদী রাজসভায় আসিতেছেন না দেখিয়া দুঃশাসন কেশাকর্ষণ করিয়া দ্রৌপদীকে রাজসভায় লইয়া আসিল। দ্রৌপদী নির্য্যাতিত হইয়া পাণ্ডবগণকে এবং ভীষ্ম, কৃপাচার্য্য প্রভৃতিকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। অবশেষে যখন দুঃশাসন তাঁহার বস্ত্র ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল, তখন দ্রৌপদী কাতরস্বরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর ডাক শুনিলেন। দুঃশাসন যতই কাপড় টানে, ততই কাপড় বাড়িতে লাগিল, অবশেষে দুঃশাসন ভগ্নোৎসাহ হইয়া বসিয়া পড়িল। দ্রৌপদীর সেই সময়ের বীরত্ব-দর্শনে ধৃতরাষ্ট্র যৎপরোনাস্তি মুগ্ধ হইলেন এবং দ্রৌপদীর প্রার্থনা-মত পাণ্ডবগণের দাসত্ব মোচন করিয়া দিলেন। দ্রৌপদী ইহা ছাড়া অন্য বর চাহেন নাই। পাণ্ডবগণ হৃত রাজ্য পাইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধন কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের এই ব্যবস্থায় আদৌ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি ধৃতরাষ্ট্র দ্বারা পুনরায় যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতাকে পাশা খেলিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। যুধিষ্ঠিরাদি এবারও খেলায় হারিয়া দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসরের জন্য অজ্ঞাতবাসে চলিলেন। দ্রৌপদীও তাঁহাদের সমভিব্যাহারিণী হইলেন। যুধিষ্ঠির বনে গিয়া একদিনও কৌরবদের প্রতি কোন প্রকার অভিসম্পাত প্রদান করেন নাই। ইহা দেখিয়া দ্রৌপদী তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া বলেন, "আপনি ক্ষত্রিয় হইয়া এই যে কাপুরুষের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন, ইহার জন্য চিরদিন লোকে আপনার অখ্যাতি করিবে।" দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে সে সময় উত্তেজিত করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু যুধিষ্ঠির তাহাতে একটুও বিচলিত হন নাই।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্ত্রী সত্যভামাকে সঙ্গে লইয়া বনে দ্রৌপদীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। সত্যভামা দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা বোন! তুমি সিংহের মত পাঁচ পাঁচটি স্বামীকে কিরূপে বশ করিয়া রাখিয়াছ, কোনও মন্ত্রতন্ত্র জান কি?" দ্রৌপদী বলিলেন, "স্বামীকে বশ করিতে কি আর মন্ত্রের দরকার হয়? একান্তমনে স্বামীর সেবা-শুশ্রূষা ও স্বামীর প্রিয়কার্য্য করিলে স্বামী বশ হয়।"

ইহার কিছুদিন পরে পাণ্ডবেরা কাম্যক বনে গিয়া যখন বাস করিতে থাকেন, তখন দ্রৌপদীকে একাকিনী গৃহে দেখিয়া জয়দ্রথ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিবার চেষ্টা করিলে জয়দ্রথকে দ্রৌপদী পদাঘাতে ফেলিয়া দেন। জয়দ্রথ পুনরায় উঠিয়া দ্রৌপদীকে ধরিয়া লইয়া চলে। দ্রৌপদী ভীতা রমণীর ন্যায় একটুও রোদন করিলেন না। এমন সময় পাণ্ডব ভ্রাতাগণ আসিয়া জয়দ্রথকে বন্দী করিলেন এবং তাহার প্রাণনাশে উদ্যত হইলেন। জয়দ্রথ পাণ্ডবদের পদতলে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিল। তখন দ্রৌপদী বলিলেন, "যখন এই দুর্ব্বৃত্ত অপরাধ স্বীকার করিয়া কাপুরুষের মত প্রাণভিক্ষা করিতেছে, তখন ইহাকে ক্ষমা করিয়া ছাড়িয়া দাও।" দ্রৌপদীর অনুগ্রহে জয়দ্রথ সে যাত্রা প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছিল।

আর একবার বিরাটরাজের ভবনে যখন যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা ছদ্মবেশে এবং দ্রৌপদী স্বয়ং সৈরিন্ধ্রীর বেশে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন বিরাটরাজ-শ্যালক কীচক তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার ধর্ম্মনাশের চেষ্টা করে। দ্রৌপদী কীচককে পদাঘাতে দূরে ফেলিয়া দিয়া রাজ-সভায় গিয়া বিরাটরাজকে বলেন, "তুমি কিরূপ রাজা", 'রাজা হইয়া এই ভাবে স্ত্রীজাতির অবমাননা স্বচক্ষে দেখিতেছ?" বিরাটরাজ কোন প্রতীকার করিলেন না দেখিয়া দ্রৌপদী রাত্রিতে গোপনে ভীমসেনকে

সমস্ত কথা বলিলেন, ভীমসেন নৃত্যশালায় কীচককে বধ করিয়া দ্রৌপদী-লাঞ্ছনার প্রতিশোধ লন।

অজ্ঞাতবাস হইতে পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুরে ফিরিয়া আসিয়া রাজ্য-প্রার্থনা করিলে দুর্য্যোধন বিনাযুদ্ধে বিন্দুমাত্র ভূমি দিবেন না, বলিলেন। ফলে কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ বাধিল। ভীম দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ করিলেন। দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বত্থামা রাত্রিকালে—গুপ্তভাবে পাণ্ডব-শিবিরে আসিয়া পঞ্চপাণ্ডব-ভ্রমে দ্রৌপদীর পাঁচটি-পুত্রকে হত্যা করিল। এইরূপ অতর্কিত পুত্রহত্যায় দ্রৌপদী নিতান্ত কুপিত হইয়া পাণ্ডবগণকে বলিলেন, "কাপুরুষকে যদি উচিতমত শাস্তি না দাও, তাহা হইলে আমার যাতনা কোনরূপেই শান্তি পাইবে না।" ভীমসেন তৎক্ষণাৎ যাইয়া অশ্বত্থামার মাথার মণি আনিয়া দ্রৌপদীর হস্তে উপহার দিলেন। গুরু দ্রোণাচার্য্যের পুত্র বলিয়া ভীম কেবল তাঁহাকে প্রাণে বধ করিলেন না। দ্রৌপদী বলিলেন, "ইহাতেই অশ্বত্থামার যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে।"

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর পাণ্ডবগণ যখন মহাপ্রস্থান করেন, তখন তাঁহাদের সহিত দ্রৌপদীও যাত্রা করেন। ইন্দ্রপ্রস্থের রাজসুখকে তিনি অবহেলায় পরিত্যাগ করেন। দ্রৌপদী পতিপরায়ণা, বীর রমণী ছিলেন।

শকুন্তলা

শকুন্তলা মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কন্যা। কণ্বমুণি তাঁহাকে আপন আশ্রমে নিজের কন্যার ন্যায় লালন-পালন করিয়াছিলেন। একদিন পুরুবংশীয় রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়া করিতে করিতে কণ্বমুনির আশ্রমে উপস্থিত হন, কণ্বমুনি তখন আশ্রমে না থাকায় শকুন্তলা রাজাকে যথোচিত যত্ন-সহকারে অভ্যর্থনা করেন। রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার রূপে, গুণে ও মিষ্টসম্ভাষণে প্রীত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। শকুন্তলার গর্ভজাত পুত্র রাজা দুষ্মন্তের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইবেন, এই বন্দোবস্তে শকুন্তলা তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। অতঃপর দুষ্মন্তে ও শকুন্তলায় মাল্যবিনিময় হইয়া গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ হইল—আশ্রমের কেহ ঘুণাক্ষরেও তাহা জানিতে পারিল না। কণ্বমুনি আশ্রমে আসিয়া শকুন্তলার বিবাহের কথা শুনিয়া যোগ্য পাত্রে মাল্য দান করিয়াছেন শুনিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। আশ্রমে শকুন্তলার একটি পুত্র হইল। পুত্রটি বাল্যকালে সকল বন্য জন্তুকে আক্রমণ করিত বলিয়া লোকে তাহাকে "সর্ব্বদমন" বলিয়া ডাকিত। বালকের শিক্ষার বয়স উপস্থিত হইলে এবং আশ্রমে থাকিয়া শিক্ষালাভ অসম্ভব বুঝিয়া শকুন্তলা পুত্রকে লইয়া হস্তিনাপুরে রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া রাজা দুষ্মন্তের নিকট আত্মপরিচয় দিলেন। কিন্তু দুষ্মন্ত তাঁহাকে চিনিতে পারিতেছেন না বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। কিন্তু শকুন্তলা অভিমানভরে বলিলেন, "মহারাজ! আমি মুনিকন্যা, মিথ্যা কথা কাহাকে বলে জানি না, আমি আপনাকে বলিতেছি, আমি প্রকৃত ধর্ম্মপত্নী, ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া আপনি আমাকে বিবাহ করিয়াছেন। এখন অবলা স্ত্রীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অধর্ম্ম করিবেন না।" এমন

সময় আকাশ হইতে হঠাৎ দৈববাণী হইল এবং দৈববাণী বলিল,"শকুন্তলা আপনার স্ত্রী এবং এই বালক আপনার পুত্র।" রাজা তখন সভাসদ-গণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "এই রমণী যে আমার স্ত্রী ও এই বালক যে আমার পুত্র ইহা বুঝিতে আর আপনাদের বাকী রহিল না। আমি ও শকুন্তলা ভিন্ন আমাদের বিবাহের কথা অন্য কেহ জানে না বলিয়া আমি ঐরূপ বলিতেছিলাম।" অতঃপর শকুন্তলাকে রাজা গ্রহণ করিলেন এবং পুত্রের নাম রাখিলেন ভরত। ভরতের নাম হইতে পুরুবংশ ভরত-বংশ বলিয়া বিখ্যাত হইল। ভরতের নামানুসারেই এদেশের নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে।

দময়ন্তী

বিদর্ভরাজ ভীমের দুহিতা দময়ন্তী রাজগৃহের বিলাসসুখকে তুচ্ছ করিয়া বনে স্বামীর সঙ্গিনী হইয়াছিলেন। দময়ন্তীর অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্যের কথা শুনিয়া একদিকে নিষধরাজ নল যেমন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন, তদ্রূপ নলেরও শৌর্য্যবীর্য্যের কথা শুনিয়া দময়ন্তী তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। একদিন একটি সুন্দর হংসকে নল ধরেন, সেই হংসটি নলের নিকট প্রাণ ভিক্ষা করিয়া বলে, "যদি আপনি আমাকে ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে দময়ন্তীর সহিত আপনার বিবাহ দিয়া দিব।" নল হংসটাকে ছাড়িয়া দিলেন। হংসটি দময়ন্তীর নিকট উড়িয়া গিয়া নলের কথা তুলিয়া বলিলেন, "রাজকুমারী, যদি তুমি তোমার এই অসামান্য রূপলাবণ্য, জীবন ও যৌবন সার্থক করিতে চাও, তাহা হইলে নলকে স্বামিত্বে বরণ কর।" দময়ন্তী হংসের কথা শুনিয়া মনে মনে নলকে পতিত্বে বরণ করিলেন।

এদিকে বিদর্ভরাজ দময়ন্তীর বিবাহের জন্য এক স্বয়ম্বর-সভা আহ্বান করিলেন। অসামান্যসুন্দরী দময়ন্তীকে লাভ করিবার জন্য ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম—ইঁহারাও চারিজন সভায় গেলেন এবং যাইয়া নলকে দূতরূপে দময়ন্তীর নিকট প্রেরণ করিলেন। নল দময়ন্তীকে অনুরোধ করিলেন. "আপনি স্বয়ম্বর-সভায় দেবতা-চতুষ্টয়ের মধ্যে কাহারও গলে মাল্য অর্পণ করিয়া দেবতার মর্য্যাদা রাখিবেন বলিয়া আশা করি।" কিন্তু দময়ন্তী বলিলেন, "তাহা কখনই হইতে পারে না, আমি একবার যখন আপনাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তখন সভামধ্যে সর্ব্বজনসমক্ষে আপনারই গলে মাল্য দান করিব।" নল দময়ন্তীর কথা দেবতাদের নিকট আসিয়া বলিলেন। তখন দেবতারা নলের রূপ ধারণ করিয়া সভা মধ্যে বসিয়া

রহিলেন। দময়ন্তী মাল্য লইয়া সভামধ্যে আসিয়া দেবতাগণকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আপনারা দয়া করিয়া আপন আপন রূপ পরিগ্রহ করুন, আমি নলের গলায় মাল্য দিব স্থির করিয়াছি।" দময়ন্তীর প্রার্থনায় দেবতারা আপনআপন রূপ পরিগ্রহ করিলেন, তখন দময়ন্তী নলের গলায় মাল্য অর্পণ করিলেন।

দময়ন্তীকে লইয়া নল পরম সুখে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনা নামে তাঁহাদের একটি পুত্র ও একটি কন্যা হইল। একদিন নল তাঁহার দুষ্ট ভ্রাতা পুষ্করের সহিত অক্ষ-ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া সমস্ত রাজ্যধন হারাইলেন। নল এক বসনে রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া বনে চলিয়া গেলেন। দময়ন্তী বিপদ সম্মুখীন দেখিয়া ইতি-পূর্ব্বেই তাঁহার পুত্রকন্যাকে আপন পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; এখন স্বামীকে বনে যাইতে দেখিয়া তিনিও তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। একদিন কতকগুলি সুন্দর পাখী ধরিয়া নল ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার জন্য পাখী-গুলির উপর নিজের বসন ফেলিয়া দিলেন, পাখীগুলি সেই বসন লইয়া উড়িয়া গেল। স্বামীকে নগ্ন দেখিয়া দময়ন্তী নিজের কাপড়ের একখণ্ড ছিঁড়িয়া স্বামীকে দিলেন। অতঃপর পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া তাহারা দুই জনে এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। দময়ন্তী অত্যধিক পথশ্রান্তিহেতু ঘুমাইয়া পড়িলেন। নল ভাবিলেন, এখন যদি তিনি দময়ন্তীকে ফেলিয়া যান, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দময়ন্তী জাগরিত হইয়া বিদর্ভরাজ্যে আপন পিত্রালয়ে চলিয়া যাইবে এবং দময়ন্তীর তাহা হইলে সকল যন্ত্রণা দূর হইবে। এই ভাবিয়া নল ধীরে ধীরে নিদ্রিতা দময়ন্তীকে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। দময়ন্তী জাগরিত হইয়া বনের চারিদিকে "কোথা প্রাণেশ্বর" বলিয়া খুঁজিতে লাগিলেন। এক স্থানে একটি বৃহৎ অজগর দময়ন্তীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। দময়ন্তী কাতরস্বরে স্বামীকে ডাকিতে লাগিল, এমন সময় একটি ব্যাধ পশ্চাৎ

হইতে একটি শর নিক্ষেপ করিয়া অজগরটিকে মারিয়া ফেলিল। কিন্তু ইহাতে আর এক বিপত্তি ঘটিল। দময়ন্তীর রূপে মুগ্ধ হইয়া সেই ব্যাধ দময়ন্তীর প্রণয় ভিক্ষা করিল। দময়ন্তী তাহাতে সম্মতা না হওয়ায় সে বলপূর্ব্বক তাঁহার সতীত্ব নষ্ট করিতে উদ্যোগ করিল; কিন্তু সতী সাধ্বীর তেজের নিকট সে দাঁড়াইতে পারিল না, ভস্মীভূত হইল। দময়ন্তী আলুলায়িতকেশে, ছিন্নবসনে নানা বন অতিক্রম করিয়া চেদীরাজ্যে উপস্থিত হইলেন। তথায় চেদী-রাজমাতা তাঁহাকে ছাদ হইতে তদবস্থ দেখিয়া অতি যত্নের সহিত রাজান্তঃপুরে লইয়া আসিলেন এবং দময়ন্তীকে অভয় দিয়া আপন সকাশে রাখিলেন।

এদিকে দময়ন্তীর পিতা বিদর্ভরাজ ভীম নলের বনবাসের সংবাদ পাইয়া নানাদেশে তাহাকে সন্ধান করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। সেই লোকেরা চেদীরাজ্যে আসিয়া দময়ন্তীর সংবাদ পাইল। রাজ-মাতা দময়ন্তীর মাসী, তিনি এতদিনে দময়ন্তীর প্রকৃত পরিচয় পাইয়া উপযুক্ত রক্ষকসহ বহু টাকা-কড়ি, অলঙ্কারপত্র উপঢৌকন দিয়া তাঁহাকে বিদর্ভরাজ্যে পাঠাইলেন। এখানে আসিয়া পুত্র-কন্যার মুখ দেখিয়াও দময়ন্তীর প্রাণে শান্তি আসিল না। কন্যার ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া বিদর্ভ-রাজ নানাদিকে ব্রাহ্মণদিগকে নলের সন্ধানে পাঠাইলেন। নল অযোধ্যা-প্রদেশে রাজা ঋতুপর্ণের সারথি হইয়া বাস করিতেছিলেন। একজন ব্রাহ্মণ গিয়া অযোধ্যা নগরীতে নলের সন্ধান পাইল। দময়ন্তীর কাহিনী বলিতেই নলের মনে পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইল। তাঁহাকে বিদর্ভে আনিবার জন্য ব্রাহ্মণ বলিলেন, "দময়ন্তী দ্বিতীয়বার স্বয়ম্বরা হইবেন।" নল তাহা শুনিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে বিদর্ভরাজ্যে গেলেন, কিন্তু তথায় যাইয়া শুনিতে পাইলেন, দময়ন্তীর দ্বিতীয়বার স্বয়ম্বর মিথ্যা ছলনা মাত্র। তখন দময়ন্তীর পাতিব্রত্যে আর তাঁহার কোন সন্দেহ রহিল না। স্বামী স্ত্রীতে পুনরায় মিলন হইল; তাঁহারা পুনরায় নিষধরাজ্যে

আসিলেন। ভ্রাতা পুষ্করকে অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত করিয়া নল নিজের নষ্ট রাজ্য পুনরায় উদ্ধার করিলেন; কিন্তু পুষ্করকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া না দিয়া পুষ্করের নিজ সম্পত্তি পুষ্করকে দিলেন এবং দুই ভ্রাতায় মহাসুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন।

জনা

প্রবীর-জননী জনা মাহীষ্মতী নগরের রাজা নীলধ্বজের মহিষী। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অবসান হইলে পাণ্ডবরাজ সত্যসন্ধ মহারাজ যুধিষ্টির এক অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। অশ্বমেধের অশ্ব পৃথিবীর নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে মাহীষ্মতী নগরে উপস্থিত হইল। কুন্তী-নন্দন অর্জ্জুন সেই অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিলেন। অশ্ব মাহীষ্মতী নগরে উপস্থিত হইলে প্রবীর সেই অশ্বটিকে ধৃত করিলেন। অশ্বের সহিত অর্জ্জুন আছেন শুনিয়া রাজা নীলধ্বজ ভয়ে ভয়ে অশ্বটিকে ফিরাইয়া দিতে সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু প্রবীর তাহা শুনিয়া স্থির করিলেন,—বিনা যুদ্ধে অশ্ব ফিরাইয়া দেওয়া ঘোর কাপুরুষতার কার্য্য, তাহা কখনই হইতে পারে না। কিন্তু পিতার আদেশই বা কি করিয়া লঙ্ঘন করেন?—তিনি মহাভাবনায় পড়িলেন, ভাবিলেন ক্ষত্রিয়-জননী কখনও তাঁহাকে কাপুরুষ সাজিতে বলিবেন না। কার্য্যতঃ তাহাই হইল। জননী জনার নিকট গিয়া যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায় জানাইবা-মাত্র জনা প্রবীরের বীরত্বে যৎপরোনাস্তি সুখী হইলেন। বলিলেন, "ইহাই ত চাই বাবা! ক্ষত্রিয়ের পুত্র হইয়া উদ্ভিন্ন যৌবনে যদি কাপুরুষতার কথা বলিতে, তবে আমার দুঃখ রাখিবার স্থান থাকিত না। বীর পুত্র ব্যতীত ক্ষত্রিয় জননীর আর কি কাম্য হইতে পারে?"

রাণী জনা গিয়া রাজা নীলধ্বজের নিকট পুত্রের অভিপ্রায় জানাইলেন। রাজা নীলধ্বজ সে কথা শুনিয়া বলিলেন, "মহারাজা যুধিষ্টিরের মত অত বড় প্রবল পরাক্রান্ত রাজার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া কি আমার মত ক্ষুদ্র লোকের পক্ষে সম্ভবপর? স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের সহায় তাঁহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া অর্থে কি মৃত্যুকে ডাকিয়া আনা নহে?

রাজা নীলধ্বজের কথা শুনিয়া জনা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সে কি রাজা! ক্ষত্রিয় হইয়া তুমি একথা বলিতেছ কেমন করিয়া? তুমি না পুরুষ, পুরুষের মুখে কি এরূপ কাপুরুষের ন্যায় কথা শোভা পায়? ক্ষত্রিয় যদি ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি দেখাইতে গিয়া সম্মুখ সমরে মারাও যায়, তাহার রাজ্য-সম্পদ প্রভৃতি সকলই যদি চলিয়া যায়, তাহাও শ্লাঘনীয়, তাই বলিয়া ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিনা যুদ্ধে কাহারও নিকট মাথা নীচু করা সঙ্গত নহে।"

জনার কথা শুনিয়া রাজা নীলধ্বজ আপন কাপুরুষতা পরিত্যাগ করিলেন এবং পুত্রসহ সম্মুখ যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুকে বরণ করাও শ্লাঘনীয় বলিয়া মনে করিলেন।

অর্জ্জুনে এবং রাজা নীলধ্বজ ও প্রবীরে তৎপরদিন মহাযুদ্ধ বাধিল। প্রথম দিনের যুদ্ধে প্রবীরের নিকট অর্জ্জুন পরাজিত হইলেন, কিন্তু পরদিন শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে প্রবীর অর্জ্জুনের হস্তে যুদ্ধে নিপতিত হইলেন। বৃদ্ধ নীলধ্বজ পুত্রশোকে অত্যন্ত কাতর হইলেন। অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ নীলধ্বজের সহিত আর যুদ্ধ না করিয়া তাঁহার বন্ধুত্ব কামনা করিলেন। নীলধ্বজ শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত ছিলেন; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাবে অশ্ব ফিরাইয়া দিয়া মহাযত্নে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে আপন গৃহে লইয়া তাঁহাদের যথাযোগ্য সমাদর ও অতিথি সৎকার করিলেন। রাজার আদেশে রাজ্যময় উৎসব চলিতে লাগিল। এ দৃশ্য কিন্তু জনা সহ্য করিতে পারিলেন না, পুত্রহন্তা অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের উপর প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ না করিয়া রাজা নীলধ্বজ এইভাবে রাজ্যময় আনন্দ-উৎসবের আদেশ করিয়াছেন—ইহা অসহনীয় হওয়ায় তিনি রাজ সমীপে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আজ কি প্রবীর পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিয়া বিজয়-মুকুট পরিধান করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে? রাজ্যময় কি আজ সেইজন্য উৎসব লাগিয়াছে? এখনও যে তোমার

প্রাণাধিক প্রবীরের মৃতদেহ রণক্ষেত্রে লুটাইতেছে—এখনও যে তাহার দেহের রক্ত শুকায় নাই মহারাজ! যে কৃষ্ণ তোমার প্রাণাধিক পুত্রকে কৌশলে রণক্ষেত্রে হত্যা করিয়া আসিয়াছে, তুমি কোন্ প্রাণে তাহার অভ্যর্থনা করিতেছ?"

রাজা নীলধ্বজ জনাকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু জনা কোন মতেই প্রবোধ মানিলেন না। তিনি বলিলেন, "কাল যে পুত্রকে রণক্ষেত্রে হারাইয়াছি, আজ তাহার হন্তার প্রতি সম্মান দেখাইয়া আনন্দোৎসব করা কি মৃত সন্তানের ঘোর অবমাননা নহে? আমি ক্ষত্রিয়-রমণী হইয়া কখনও এই অপমান বুকে লইয়া এই পাপ পুরীতে থাকিতে পারিব না। তোমার প্রয়োজন হয়, রাজা তুমি, স্বচ্ছন্দে আনন্দোৎসবে মাতিয়া রাজ্য করিতে পার, পুত্রহন্তার পূজা করিয়া ধন্য হইতে পার, কিন্তু আমি এই তোমার পাপপুরী ত্যাগ করিয়া চলিলাম।" এই বলিয়া জনা পাগলিনীর মত রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া বহির্গত হইলেন, কেহ তাঁহার পথরোধ করিতে পারিল না। বহু পথ ভ্রমণ করিয়া জনা গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া গঙ্গাবক্ষে ঝম্প প্রদান করিলেন।

খনা

খনা সিংহল-দ্বীপে প্রতিপালিতা হইয়া জ্যোতিষশাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সেই স্থানে মিহিরের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং উভয়ে বিবাহান্তে উজ্জয়িনীতে আসিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্যের আশ্রয়ে বাস করিতে থাকেন। মিহির বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের মধ্যে অন্যতম রত্ন ছিলেন। বরাহ যখন পরিচয় পাইলেন যে, মিহির তাঁহার পুত্র এবং খনা তাঁহার পুত্রবধূ, তখন তিনি খনাকে মহাযত্নে আপন বাটীতে লইয়া গেলেন। খনা জ্যোতিষশাস্ত্রে এতদূর ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, তিনি অবলীলাক্রমে জ্যোতিষের বড় বড় তত্ত্ব নিরাকরণ করিতে পারিতেন। বরাহ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজসভার জ্যোতিষী ছিলেন, কাজেই অনেকে তাঁহার নিকট গণনার জন্য আসিত। বরাহ প্রশ্নকর্ত্তাদের যেসমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেন না, খনা গৃহমধ্য হইতে সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেন, ইহাতে বরাহ মনে মনে খনার প্রতি রাগান্বিত হন। দিন দিন দেশের সর্ব্বত্র খনার খ্যাতি-প্রতিপত্তি বাড়িতে থাকে—চারিদিকে খনার যশোরাশি বিস্তীর্ণ হয়।

এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, একদা মহারাজ বিক্রমাদিত্য আপন সভা-পণ্ডিতগণকে আকাশে কত নক্ষত্র আছে তাহা গণনা করিতে বলেন, কিন্তু সকলেই অকৃতকার্য্য হন। রাজসভার জ্যোতিষী বরাহকে এই নক্ষত্র-গণনার ভার দিলে বরাহ পরদিন প্রাতে প্রশ্নের উত্তর দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন। কিন্তু বাটীতে ফিরিয়া বরাহ বিষণ্ণ-মনে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন। খনা শ্বশুরের বিষাদের কারণ বুঝিতে পারিয়া বলেন—

"সাত সাত আরও সাত, সাতে দিয়া ভরা,
ভাত খাওসে শ্বশুরঠাকুর আকাশে এত তারা।"

পরদিন রাজসভায় বরাহ এই বচনটি আবৃত্তি করিবামাত্র মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা কি আপনার স্বরচিত ?" বরাহ স্বীকার করেন যে, বচনটি তাঁহার পুত্রবধূ খনার। মহারাজ বিক্রমাদিত্য খনাকে যথোচিত পুরস্কার দিবার জন্য তাঁহাকে রাজসভায় আনিতে আদেশ করেন। কিন্তু কুলবধূকে রাজসভায় উপস্থিত করা অবমাননা-জনক বলিয়া বরাহ মিহিরকে খনার জিহ্বাচ্ছেদ করিতে আদেশ করেন। মিহির পিতার এইরূপ অন্যায় আদেশ প্রতিপালন করিয়া একটি নির্দ্দোষিণী স্ত্রীলোকে শাস্তি দিতে সম্মত হন না। কিন্তু সেই সংবাদ খনার কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি স্বহস্তে আপনার রসনা কর্ত্তন করেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার প্রাণবায়ুও বহির্গত হইয়া যায়।

নিম্নে খনার অসংখ্য বচনের মধ্যে কতিপয় মাত্র উদ্ধৃত হইল :—

যাত্রার লক্ষণ

ভরা হ'তে শূন্য ভাল যদি ভ'রতে যায়,
আগে হ'তে পিছু ভাল যদি ডাকে মায় ;
মরা হ'তে জ্যান্ত ভাল যদি ম'রতে যায়,
বাঁয়ে হ'তে ডাইনে ভাল যদি ফিরে চায়।
বাঁধা হ'তে খোলা ভাল, মাথা তুলে চায়,
হাসা হ'তে কাঁদা ভাল যদি কাঁদে বাঁয়।

যাত্রার শুভাশুভ নিরূপণ

মঙ্গলের ঊষা বুধে পা যথা ইচ্ছা তথা যা।
রবি গুরু মঙ্গলের ঊষা, আর সব ক্যাসাকুসা।
ডাকয়ে পক্ষী না ছাড়য়ে বাসা, উড়িয়া বৈসে গাবে হেন আশা।
ফিরে যায় বাসে না পায় দিশা, খনা ডেকে বলে সেই সে ঊষা।

উড়ে পাখী খায় না, তখনি কেন যায় না।
দ্বাদশ অঙ্গুলি করিয়া কাঠি, সূর্য্যমণ্ডলে দিয়া দাঠি,
রবি কুড়ি সোমে ষোল, পঞ্চাশ মঙ্গলে ভাল।
বুধ এগারো বৃহস্পতি বারো, শুক্র চৌদ্দ শনি তেরো।
হাঁচি জ্যেষ্ঠি পড়ে যবে, অষ্টগুণ লভ্য হবে।
শূন্য কলসী শুক্‌না না, শুক্‌না ডালে ডাকে কা।

দুর্লক্ষণ

দিনে জল রাতে তারা
এই দেখ্‌বে দুঃখের ধারা।

১। কি করো শ্বশুর লেখা-জোখা, মেঘেই বুঝ্‌বে জলের লেখা।
কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা, মধ্যে মধ্যে দিচ্চে বা।
ব'লো চাষায় বাঁধতে খাল, আজ না হয় হ'বে কাল।
২। পশ্চিমের ধনু নিত্য খরা, পূর্ব্বের ধনু বর্ষে ঝরা।
৩। বেঙে ডাকে ঘন ঘন, শীঘ্র বৃষ্টি হবে জানো।
৪। ভাদুরে মেঘে বিপরীত বায়, সেদিনে বৃষ্টি কে ঘোচায়।
৫। পৌষের কুয়া বৈশাখের জল, য দিন কুয়া ত দিন জল।

চাষীর প্রতি উপদেশ

আট হাত অন্তর এক হাত বাই,
কলা পুত্‌গে চাষা ভাই
পুঁতে কলা না কেট পাত
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।
তিন শ ষাট ঝাড় কলা রুয়ে
থাক্‌গে চাষী খাটে শুয়ে॥

বন্যা লক্ষণ

পূর্ণ আষাঢ় দক্ষিণা বয়,
সেই বৎসর বন্যা হয়।
আমে ধান, তেঁতুলে বান।

অনাবৃষ্টি

পৌষে গরমি, বৈশাখে জাড়া,
প্রথম আষাঢ়ে ভরবে গাড়া।
খনা বলে শুন হে স্বামী
শ্রাবণ ভাদর নাহিক পানি॥

বর্ষার ফল

১। কর্কট ছরকট্ সিংহে শুকা, কন্যা কাণে কাণ,
বিনা বায়ে বর্ষে তুলা, কোথা রাখ্‌বি ধান।

২। যদি বর্ষে অঘানে, রাজা যান মাগনে,
যদি বর্ষে পৌষে, কড়ি হয় তুষে।
যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।
যদি বর্ষে ফাগুনে, চিনা কাউন দ্বিগুণে॥

৩। জৈষ্ঠে শুকো—আষাঢ়ে ধারা
শস্যের ভার না সহে ধরা।

৪। যদি বর্ষে মকরে, ধান হবে টে করে

৫। হেসে চাকি বসে পাটে,
শস্য সেবার না হয় মোটে।

মৃত্যুগণনা

আসিয়া দূত দাঁড়ায় কোণে
কথা কহে ঊর্দ্ধ নয়নে॥

শিরে পৃষ্ঠে বুকে হাত।
সেই দূতে পৌছে বাত॥
কুঁটো ছিঁড়ে করে খাই।
খনা বলে ফুরাল আই॥

আদ্য ঋতুর বার ফল

রবিতে বিধবা হয়, সোমে পতিব্রতা।
মঙ্গলেতে বেশ্যা, বুধে সৌভাগ্য-সংযুক্তা॥
বৃহস্পতিবারে স্বামী লক্ষ্মীমন্ত হয়।
শুক্রবারে বহুপুত্র দীর্ঘজীবী রয়॥
শনিবারে হবে বন্ধ্যা জ্যোতিষের মতে।

আদ্য ঋতুর মাস ফল

জ্যৈষ্ঠেতে বিধবা হয়, আষাঢ়েতে ধনী।
মৃতাপত্যা শ্রাবণেতে, ভাদ্রেতে রোহিণী।
আশ্বিনেতে মৃতাপত্যা হইবে কামিনী।
কার্ত্তিকেতে ঋতুমতী স্বকুলনাশিনী
মার্গশীর্ষে ঋতু যার হয় ধর্ম্মশীলা।
পৌষেতে হইলে ঋতু রতিতে বিহ্বলা॥
মাঘে পতিব্রতা নারী হইলে ঋতুমতী।
ফাল্গুনে হইলে ঋতু বহু পুত্রবতী॥
মদনোন্মাদিনী হয়, হইলে চৈত্রেতে
সুপ্রিয়বাদিনী যার ঋতু বৈশাখেতে॥

তিথি গণনা

খালি ছাগ্‌লি বৃষে চাঁদা মিথুনে পূরিয়ে বেদা।
সিংহ বসু কর কি ব'সে আর সব পূরিয়ে দশে॥

বাহুল্যভয়ে খনার অন্যান্য বচন আর উল্লেখ করা হইল না।

শর্ম্মিষ্ঠা

শর্ম্মিষ্ঠা যযাতির কনিষ্ঠা স্ত্রী ও দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বের দুহিতা ছিলেন। শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীর সহিত ইহার সখীভাব ছিল। কোন সময়ে উভয়ে স্নানার্থ গমন করিয়া যথেচ্ছ জলক্রীড়া করেন। দেবযানী প্রথমে জল হইতে উঠিয়া ভ্রমপ্রযুক্ত শর্ম্মিষ্ঠার বস্ত্র পরিধান করেন। ইহাতে শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীকে বিশেষ প্রকার তিরস্কার করেন। তাহাতে উভয়ে বিবাদ ও হাতাহাতি আরম্ভ হয়। শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীকে একটি কূপে ফেলিয়া দিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যযাতি তাঁহাকে কূপ মধ্যে পতিত দেখিয়া উদ্ধার করেন। দেবযানীর পিতা দেবযানীর ক্রোধ দূর করিবার মানসে শর্ম্মিষ্ঠাকে দেবযানীর পরিচারিকা-পদে নিযুক্ত করেন। দেবযানী যখন যযাতির মহিষী হইয়া গমন করেন, তখন শর্ম্মিষ্ঠা পরিচারিকারূপে দেবযানীর অনুগমন করেন। ক্রমে শর্ম্মিষ্ঠার সহিত যযাতির গুপ্তপ্রণয় হয় এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরুনামে তিন পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। ঘটনাচক্রে ইহার কনিষ্ঠ পুত্র পুরুই পৈতৃক সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। দেবযানী ইহাতে বিশেষ মনোকষ্টে কালাতিপাত করিয়াছিলেন।

সুভদ্রা

সুভদ্রা অর্জ্জুনের পত্নী। ইনি রোহিণীর গর্ভে এবং বসুদেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে ইনি অর্জ্জুনের নয়নপথে পতিত হইবামাত্র অর্জ্জুন ইঁহার রূপে মুগ্ধ হন। সুভদ্রা শ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভগিনী হইলেও শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সুভদ্রা-হরণের পরামর্শ প্রদান করেন। অর্জ্জুন তাহাই করেন। সুভদ্রার গর্ভে অর্জ্জুনের অভিমন্যু-নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পাণ্ডবগণ যে সময়ে বনবাসে গমন করেন, তখন সুভদ্রা পুত্রসহ পিত্রালয়ে অবস্থান করিতেছিলেন। তৎপর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তিনি দ্রৌপদীর সহিত পাণ্ডব-শিবিরে অবস্থান করিয়াছিলেন। সুভদ্রা আপন হস্তে বালক পুত্র অভিমন্যুকে যুদ্ধসাজে সজ্জিত করিয়া কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধে অভিমন্যু নিহত হন, তাহাতে সুভদ্রা শোকাভিভূতা হন নাই। পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সহিত মহাপ্রস্থান করিলে সুভদ্রা হস্তিনাপুরে থাকিয়া তপশ্চরণে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিয়াছিলেন।

রুক্মিণী

রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী—বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের দুহিতা। যৌবন সমাগত দেখিয়া জরাসন্ধের আদেশে বিদর্ভরাজ শিশুপালের সহিত রুক্মিণীর বিবাহ স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু রুক্মিণী তাহাতে সম্মত হন নাই। তিনি ইতিপূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ ও কর্ম্মকুশলতার বিষয় অবগত হইয়া মনে মনে তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। তৎপরে কৃষ্ণ বলরামাদির সহিত বিদর্ভনগরে উপস্থিত হইলে তাঁহাদের সহিত

যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে তিনি বিপক্ষদলকে পরাভূত করিয়া রুক্মিণীকে হরণ করিয়াছিলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে বিবাহ করেন। রুক্মিণীর গর্ভে প্রদ্যুম্নাদি দশ পুত্র ও চারুমতী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। যদুবংশ ধ্বংস হইলে রুক্মিণীকে অর্জ্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে আনয়ন করেন। রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া জ্বলন্ত অনলে প্রাণ পরিত্যাগ করেন।

মদালসা

পুরাকালে ভারতবর্ষে শত্রুজিৎ নামে এক পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তাঁহার ঋতধ্বজ নামে এক পুত্র ছিল। একদিন রাজা শত্রুজিতের নিকট গালব নামে এক ঋষি একটি অপূর্ব্ব ঘোটক লইয়া উপস্থিত হন। এই ঘোটক একাদিক্রমে একটুও শ্রান্ত ক্লান্ত না হইয়া সমস্ত ভুবন পরিক্রম করিতে পারিত বলিয়া ইহা "কু-বল" নামে সাধারণ্যে পরিচিত হয়। কুবল অশ্বের নামানুসারে ঋতধ্বজকে অনেক সময় কুবলয়াশ্ব বলিয়া ডাকা হইত। গালব ঋষি রাজাকে অশ্বটি দিয়া বলিলেন, "মহারাজ! দানবেরা নানা রূপ ধারণ করিয়া আমাদের আশ্রমে আসিয়া উৎপাত-উপদ্রব করে অতএব দানবদের দমনের জন্য এই ঋতধ্বজকে প্রেরণ করুন।" রাজা শত্রুজিৎ ঋষির কথানুসারে পুত্র ঋতধ্বজকে তাঁহার সহিত প্রেরণ করিলেন। ঋতধ্বজ বাহুবলে দানবগণকে দমন করিয়া আশ্রমের অশান্তি দূর করিলেন। একদিন কিন্তু এক ভয়াবহ দানব আশ্রমে অশান্তি উৎপাদনের জন্য আগমন করে, আশ্রমবাসীরা তাহার ভয়ে সকলে চীৎকার করিতে লাগিলেন। কুবলয়াশ্ব দানবের পশ্চাদনুসরণ করিলেন। দানব

কুবলয়াশ্বের শরে নিপীড়িত হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল, তখন কুবলয়াশ্বও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। দানবের পশ্চাদনুসরণ করিতে করিতে তিনি এক জনশূন্য পুরীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় আসিয়া তিনি কোন দানবকে দেখিতে পান না, দেখিতে পান একটি রমণীকে। রমণী রাজপুত্রকে দেখিয়া একটি অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করেন, রাজকুমারও অট্টালিকার মধ্যে গিয়া দেখেন, একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতী এক খট্টাঙ্গে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। পরিচয়ে তিনি জানিতে পারিলেন, এই যুবতীটির নাম মদালসা, দানবেরা তাঁহাকে হরণ করিয়া আনিয়াছে। ক্রমে রাজকুমার কুবলয়াশ্বের সহিত মদালসার প্রণয় হয় এবং তাঁহারা পরস্পর পরিণয়-পাশে আবদ্ধ হন। দানবদিগের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া কুবলয়াশ্ব মদালসাকে লইয়া অশ্বারোহণে রাজধানীতে উপনীত হন। তদবধি ঋতধ্বজ প্রতিদিন আশ্রমের শান্তিরক্ষা ও দানব-ধ্বংসের জন্য বাহির হইতেন।

দুষ্ট দানবেরা কিন্তু ঋতধ্বজকে জব্দ করিবার জন্য নানারূপ মায়ার ফাঁদ বিস্তার করিল। একটা দুষ্ট দানব ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া কঠোর তপস্যার ভাণ করিতে লাগিল। যুবরাজ ঋতধ্বজ সেই তপোবনে উপস্থিত হইলে মুনিরূপী দানব তাঁহাকে বলিল, "আপনি আমার আশ্রম রক্ষা করুন, ব্রাহ্মণদিগকে যজ্ঞদক্ষিণা দিবার জন্য কিছু সুবর্ণের প্রয়োজন, যদি আপনি সদয় হইয়া আপনার ঐ কণ্ঠভূষণখানি দান করেন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হই।" রাজপুত্র চিরদিন ব্রাহ্মণ-ভক্ত ছিলেন, ব্রাহ্মণকে তাঁহার অদেয় কিছুই ছিল না। তিনি হৃষ্টচিত্তে সেই কণ্ঠ-ভূষণ ব্রাহ্মণরূপী দানবকে দান করিলেন। এদিকে ঋতধ্বজকে আশ্রমরক্ষার্থে নিযুক্ত করিয়া দুষ্ট দানব ঋতধ্বজের পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "আপনার পুত্র দানবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, মৃত্যুকালে তিনি এই কণ্ঠভূষণটি আপনাকে দিবার জন্য

অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা মুনি, আমরা এই সুবর্ণের কণ্ঠভূষণ লইয়া কি করিব?" মুনির এই কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত শোকান্বিত হইলেন, রাজপুত্রবধূ মদালসা স্বামীর শোকে প্রাণত্যাগ করিলেন। রাণী রাজাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "আপনি কেন পুত্রশোকে কাতর হইতেছেন? আমার পুত্র ব্রাহ্মণ ও ঋষি-মুনিগণকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছে শুনিয়া আমি যে পরিমাণ আনন্দ লাভ করিয়াছি, অন্য কোন কিছুতে আমি সেরূপ আনন্দ লাভ করিতে পারিতাম না।"

এইভাবে সেই দানব রাজ-পরিবারস্থ সকলকে শোকে অভিভূত করিয়া কুবলয়াশ্বের নিকট ফিরিয়া আসিল। কুবলয়াশ্ব তাঁহার আশ্রমের ভার তাঁহাকে পুনরায় প্রদান করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পিতামাতার আর আনন্দের সীমা রহিল না। মদালস জনৈক নাগরাজের চেষ্টায় পুনর্জীবন লাভ করিলেন, মদালসাকে পাইয়া ঋতধ্বজের আনন্দের আর সীমা থাকিল না। কালক্রমে রাজা শত্রুজিৎ স্বর্গারোহণ করিলেন এবং প্রজাবৃন্দ কুবলয়াশ্বকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিল। কুবলয়াশ্ব অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজা-পালন করিয়া সকলের প্রীতিভাজন হইলেন। মদালসার গর্ভে রাজা ঋতধ্বজের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল, তিনি সেই পুত্রের নাম রাখিলেন 'বিক্রান্ত'। বিক্রান্তকে মদালসা সর্ব্বদা তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিয়া বলিতেন, "বাবা! এ সংসারে তুমি আমি বলিয়া কিছুই নাই। এই যে দেহের তুমি এত বড়াই করিতেছ, এই দেহ তোমার নাই। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী কেহই সংসারে আপনার নহে কিংবা এই ভোগ-বিলাস-প্রবল সুখও সুখ নহে। সকলের সার যে ভগবান, সেই ভগবানে মনপ্রাণ নিবদ্ধ কর।

রাণী মদালসা এই প্রকারে পুত্রকে তত্ত্বজ্ঞান শিখাইতেন। কালক্রমে তাঁহার গর্ভে সুবাহু ও শত্রুমর্দ্দন নামে আরও দুইটি সন্তান জন্মগ্রহণ

করে ; ইহাদিগকেও তিনি নানারূপ তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। অতঃপর চতুর্থ পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে রাণী মদালসা স্বয়ং তাহার নাম রাখিলেন 'অলর্ক'। রাজা বলিলেন, "আচ্ছা রাণী পুত্রটির নাম অলর্ক রাখিলে কোন্ বিবেচনায়? 'অলর্ক' কথার কি কোন অর্থ আছে?" রাণী বলিলেন, "নামের আবার কোন অর্থ হয় কি? তুমি যে পুত্রদের নাম 'বিক্রান্ত' 'সুবাহু' 'শত্রুমর্দ্দন' রাখিয়াছ, তাহারও কোন অর্থ আছে কি? আত্মা সর্ব্বগত, সর্ব্বব্যাপী; সুতরাং আত্মার কোন গতি নাই বলিয়া 'বিক্রান্ত' নামের কোন অর্থ হইতে পারে না। আত্মা রূপহীন বলিয়া, তাঁহার কোন বাহু থাকাও সম্ভবপর নহে। আর আত্মা সকল শরীরেই বিদ্যমান; সুতরাং তাঁহার আবার শত্রুই বা কে আর মিত্রই বা কে? কাজেই নামকরণ একটা লোকাচার ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সুতরাং আমার অলর্ক নামও বৃথা হয় নাই।"

রাণী মদালসা অন্যান্য পুত্রগণের ন্যায় অলর্ককেও তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিতে লাগিলেন। রাজা ঋতধ্বজ রাণীকে বলিলেন, "ছেলেকে তত্ত্বজ্ঞান না শিখাইয়া কর্ম্মমার্গের উপদেশ দাও।" রাজার আদেশে রাণী মদালসা অলর্ককে এরূপ সমস্ত কর্ম্মমার্গের উপদেশ দিতে লাগিলেন যে, ভাবী জীবনে অলর্ক একজন সর্ব্বগুণসম্পন্ন, কর্ম্মবীর নরপতিতে পরিণত হইয়াছিলেন।

মহারাজ অলর্ক বহুকাল ন্যায়ানুসারে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। কিন্তু এত ভোগসুখের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহার ভোগ-কামনা দূর হইল না। ইহা শুনিয়া অলর্কের ভ্রাতা 'সুবাহু'—যিনি বৈরাগ্য-প্রযুক্ত বিষয়-বিরাগী হইয়াছিলেন এবং বনে বাস করিতেন, তিনি ভ্রাতাকে তত্ত্বজ্ঞান শিখাইবার নিমিত্ত কৌশলে তাঁহাকে বনে আনিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তিনি অলর্কের রাজ্যলাভের জন্য প্রবল শক্তিমান কাশী-অধিপতির সহিত মিলিত হইয়া অলর্কের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন।

দূতের কথা শুনিয়া অলর্ক কাশীরাজকে বলিয়া পাঠাইলেন, "যদি আমার ভ্রাতা সুবাহু আসিয়া আমার নিকট প্রণয়-সহকারে রাজ্য প্রার্থনা করেন, আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিব, কিন্তু যদি তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহের ভয় দেখান, তাহা হইলে আমি বিনা যুদ্ধে তাঁহাকে সূচ্যগ্র ভূমিও প্রদান করিব না; যেহেতু আমি ক্ষত্রিয় বলিয়া বিনাযুদ্ধে পরাজয়-স্বীকার করা আমার পক্ষে মহাপাপ।" কিন্তু সুবাহু সে কথা শুনিলেন না, তিনি কাশীরাজের সৈন্য-সামন্তদের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ ও দুর্গ অবরোধ করিলেন। অলর্কের অনেক সৈন্য-সামন্ত মারা গেল। অলর্ক দিন দিন ক্ষীণকায় ও ব্যাকুলচিত্ত হইতে লাগিলেন। তখন মদালসার অঙ্গুরীয়কের কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি অঙ্গুরীয়কের ভিতরকার শাসনপত্র বাহির করিয়া পাঠ করিয়া দেখিলেন, তাহাতে লিখিত আছে—"সর্ব্বান্তঃকরণে সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। যদি সঙ্গত্যাগে সমর্থ না হও, তাহা হইলে সেই সঙ্গ সাধু-গণের সহিত করিবে; যদি উহা পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে মুক্তির কামনা করিবে, কেন না উহাই তাহার ঔষধ।"

এই অনুশাসন পাঠ করিয়া অলর্ক জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্য প্রদান করিয়া আত্মজ্ঞানলাভের জন্য অরণ্যে গমন করিলেন এবং অল্পকালের মধ্যে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন।

অলর্ক এই যে আত্মজ্ঞানের প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, ইহা যে তাঁহার স্নেহময়ী মাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত, একথা বলাই বাহুলা।

বেহুলা

বেহুলা বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত নিছনি গ্রামের সায়বেণে নামক বণিকের কন্যা। বেহুলার বাল্যকাল সাধারণ বালিকাদেরই ন্যায় অতিবাহিত হয়, তাহাতে কোন বৈচিত্র্য ছিল না। ক্রমে বেহুলা বিবাহ-বয়সে উপনীত হইলে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চম্পক (সাধারণতঃ চাম্পাইনগর) নামে প্রসিদ্ধ গ্রামের চাঁদ সদাগরের সাত পুত্রের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ লখিন্দরের সহিত তাঁহার বিবাহ-সম্বন্ধ হয়। • চাঁদ সদাগর একজন সুপ্রসিদ্ধ বণিক ছিলেন ; ধনে, মানে, কুলে, শীলে গন্ধবণিক-গণের মধ্যে সে সময়ে তাঁহার ন্যায় প্রতিপত্তিশালী লোক অতি কম ছিল। তিনি পরম শৈব ছিলেন। কিন্তু তিনি মনসাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। তিনি ভ্রমেও কখনও মনসার নাম করিতেন না, অবজ্ঞা করিয়া মনসা-দেবীকে "চ্যাংমুড়ী কাণী" ইত্যাদি বলিতেন। তাঁহার প্রভাবে অন্য কেহই মনসার পূজা করিত না। এদিকে চাঁদের পত্নী সনকা সর্পাধিষ্ঠাত্রী মনসাদেবীকে বড়ই শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন, স্বামীকে লুকাইয়া তিনি মনসার পূজা করিতেন।

মনসা-দেবী চাঁদ সদাগরের ঈদৃশ বৈরভাব-দর্শনে প্রতিশোধ লইতে ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি একে একে চাঁদ সদাগরের ছয়খানি বোঝাই নৌকা নদীতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। চাঁদের ছয়টি পুত্রকে সর্প দ্বারা দংশন করাইয়া যমালয়ে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তথাচ চাঁদ মনসার প্রতি খড়্গহস্ত ছিলেন।

লখিন্দরের বিবাহ বেহুলার সহিত স্থির হইলে মনসা-দেবী বেহুলাকে ছলনা করিবার জন্য বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে সায়বেণের

পুষ্করিণীতে উপস্থিত হন। সায়-দুহিতা বেহুলা স্নান করিবার সময় সন্তরণ করিতে থাকে, হঠাৎ তাহার পায়ের এক বিন্দু জল ব্রাহ্মণীর গাত্রে লাগে। ব্রাহ্মণী এইরূপ একটা ছুঁতাই খুঁজিতেছিলেন। তিনি বেহুলাকে অভিশাপ দিলেন যে, বিবাহের প্রথম রাত্রিতেই সে বিধবা হইবে এবং সর্প-দংশনে তাহার স্বামীর প্রাণান্ত হইবে। চাঁদের পত্নী সনকা কন্যার মুখে এই অভিশাপের কথা শুনিয়া স্বামীকে কত প্রকারে বুঝাইলেন যে, দেবতার সহিত কোন প্রকার বাদ-বিসম্বাদ করিতে নাই, করিলে নিজেদেরই অমঙ্গল হইবে। কিন্তু চাঁদ কোন মতেই সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন না। তবে যাহাতে মনসা লখিন্দরের কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে না পারে, সেজন্য নিকটবর্ত্তী শাতালী পর্ব্বতে পুত্রের জন্য এক লৌহ-নির্ম্মিত গৃহ রচনা করিয়া দিলেন। বিবাহের পূর্ব্বে বর-কন্যার বাসর নির্ম্মিত হইল। মনসা দেখিলেন—মহাবিপদ। লৌহ-নির্ম্মিত গৃহে তিনি কেমন করিয়া প্রবেশ করিবেন? তিনি গৃহ-নির্ম্মাতা শিল্পী বিশ্বকর্ম্মাকে অনুরোধ করিলেন যেন বাসর-গৃহের দেওয়ালে একটি ছিদ্র করিয়া রাখা হয়। মনসা-দেবীর অনুরোধে বিশ্বকর্ম্মা তাহাই করিলেন। যথাসময়ে নিছনিগ্রামে বেহুলার সহিত লখিন্দরের বিবাহ হইয়া গেল। পুত্রবধূ লইয়া মহাড়ম্বরে চাঁদ চাম্পাই নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ফুলশয্যার রাত্রিতে বর-ক'নেকে শাতালী পর্ব্বতের লৌহময় গৃহে বাস করিবার জন্য পাঠান হইল। নববিবাহিত দম্পতী রজনীর প্রথম ভাগ মহানন্দে অতিবাহিত করিলেন। অতঃপর লখিন্দর ঘুমাইয়া পড়িলেন, কিন্তু বেহুলা ঘুমাইলেন না। তাঁহার মনে ব্রাহ্মণীর সেই অভিশাপ তখনও জাগরূক রহিয়াছে। তিনি সারারাত্রি জাগিয়া স্বামীকে পাহারা দিতে লাগিলেন। এদিকে মনসাদেবী কত শত সর্পকে সেই লৌহগৃহে প্রবেশ করিবার জন্য পাঠাইলেন, ২।৩টি ব্যতীত আর কেহ সেই স্বল্প-

পরিসর রন্ধ্রের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিল না। বেহুলা সেই তিনটিকেই ধরিয়া ফেলিলেন।

কিন্তু শেষ রাত্রে অভাগী বেহুলা ঘুমাইয়া পড়িলেন, তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও নিদ্রার হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। এই সুযোগে মনসাদেবীর আদেশে কালীয় নামে বিষধর সর্প সেই ছিদ্রপথ দিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। লখিন্দরের পায়ের নিকট কালীয় নাগ চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। এমন সময় লখিন্দর একবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন। পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনের সময় তাঁহার পায়ের আঘাত কালীয় নাগের শরীরে লাগিল, এই অপরাধে কালীয় নাগ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দংশন করিল। লখিন্দর তাড়াতাড়ি বেহুলাকে জাগাইলেন। বেহুলা স্বামীর যন্ত্রণা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেন। বেহুলা কালীয় নাগকে দেখিতে পাইয়া সোনার জাঁতি দিয়া তাহাকে আঘাত করিলেন, সেই আঘাতে কালীয় নাগের পুচ্ছ কাটিয়া গেল, কালীয় নাগ সেই ছিদ্রপথ দিয়া পলায়ন করিল। লখিন্দর তীব্র বিষের জ্বালায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন। অচিরাৎ এই দারুণ সংবাদ চাঁদ সদাগরের বাড়ীতে গিয়া পৌছিল—সনকার নিদ্রাভঙ্গ হইল। পুত্রবধূর ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া সনকা অবিলম্বে শাতালী পর্ব্বতে উপনীত হইলেন। পুত্রবধূর ক্রোড়ে একমাত্র হৃতাবশিষ্ট পুত্রের মৃতদেহ দেখিয়া চাঁদ-পত্নী ভূমিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। চাঁদসদাগরও পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। চাঁদ অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া অবশেষে পুত্রের ঔর্দ্ধদেহিক অনুষ্ঠানের জন্ম প্রবৃত্ত হইলেন। বেহুলা বলিলেন, "তিনি মৃত পতির দেহ ধারণ করিয়া ভেলায় ভাসিয়া যাইবেন এবং যে কোন প্রকারে হউক, মৃত পতিকে পুনর্জীবিত করিবেন। পুত্রবধূর দৃঢ় সঙ্কল্প দেখিয়া চাঁদ কদলী-বৃক্ষের মান্দাস বা ভেলা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। বেহুলা লখিন্দরের

শব লইয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। ভেলা গাঙ্গুর নদীর জলে ভাসিয়া চলিল। পূর্ব্বে ঐ গাঙ্গুর নদী বর্দ্ধমানের বৈদ্যডাঙ্গা দিয়া প্রবাহিত হইত; তখন উহা স্রোতস্বতী ও দুকুলপ্লাবিনী ছিল; কিন্তু কালচক্রের আবর্ত্তনে এক্ষণে উহা শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত। নদীর স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কলার ভেলা দক্ষিণে বামে কত গ্রাম অতিক্রম করিয়া গেল। নদীর উভয় তীরে কত স্ত্রীপুরুষ জমা হইয়া বেহুলার পাতিব্রত্যের প্রশংসা করিতে লাগিল, আবার কেহ বা তাঁহার নিবুর্দ্ধিতার জন্য তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। বেহুলা কাহারও কথাতেই কোন প্রকার কর্ণপাত করিলেন না। নদীমধ্য হইতে শবভুক্ জলজন্তুগণ উঠিয়া ভেলা আক্রমণ করিতে লাগিল, বেহুলা অতি কষ্টে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। কোন কোন দুর্ব্বৃত্ত গ্রামবাসী তাঁহার ভুবনমোহন রূপমাধুর্য্য দেখিয়া, নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহার প্রণয় প্রার্থনা করিল, বেহুলার মন তাহাতেও টলিল না। কেহ কেহ বা তাঁহাকে ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল। এই ভাবে দিনের পর দিন তিনি অনাহারে থাকিয়া স্বামীর মৃতদেহ রক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে লখিন্দরের শবদেহ পচিয়া উঠিল। শব-দেহের পূতিগন্ধে চারিদিক দুর্গন্ধময় হইয়া উঠিল। বেহুলা তাহাতে একটু মাত্র হতাশ না হইয়া সযত্নে স্বামীর শব রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এইভাবে ভেলায় ভাসিতে ভাসিতে বেহুলা স্বামীর শব লইয়া ভাগীরথী নদীতে উপনীত হইলেন। পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর জলে তিনি নিজে অবগাহন করিয়া স্বামীর শব উত্তমরূপে গঙ্গাজলে বিধৌত করিলেন। অতঃপর সেই তরঙ্গিত নদীর জলে ভেলা ভাসাইয়া বেহুলা আবার চলিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি মুক্তবেণী ত্রিবেণীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন প্রাতঃকাল, পূর্ব্বগগনে বাল ভানুর অস্পষ্ট কিরণ-রেখা পতিত হইয়াছে, গাছে গাছে বিহঙ্গমসকল দিবসের

আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। বেহুলা দেখিতে পাইলেন, এক রজকিনী ত্রিবেণীর ঘাটে মলিন বস্ত্র ধৌত করিবার জন্য উপস্থিত হইল, মাথা হইতে বস্ত্রের বোঝা নামাইয়া সে কোল হইতে স্তন্য-দানান্তর শিশু পুত্রটিকেও নামাইল এবং গলা টিপিয়া শিশুটিকে মারিয়া রাখিয়া কাপড় কাচিতে লাগিল। বেহুলা এই দৃশ্য দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, তিনি সেই ঘাটে ভেলা বাঁধিয়া রজকিনীর কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। ক্রমে দিবাবসান হইল। যে মার্ত্তণ্ডদেব এতক্ষণ ধরণীবক্ষে অগ্নিবর্ষণ করিতেছিলেন, তিনি স্তিমিতপ্রায় হইলেন। পৃথিবীর উপর সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারের পূর্ব্বাভাস পরিলক্ষিত হইল। দিবসের শ্রমে শ্রান্ত-ক্লান্ত পথিকেরা ত্বরিতপদে আপন আপন গৃহাভিমুখে ফিরিতে লাগিল। পক্ষিসকলও পক্ষ মেলিয়া কুলায়াভিমুখে ফিরিতে লাগিল। এইবার রজকিনীরও গৃহে প্রত্যাগমনের সময় হইয়াছে দেখিয়া সে আস্তে আস্তে ধৌত বস্ত্রাদি সমস্ত একত্র করিয়া শিশু পুত্রটিকে পুনর্জ্জীবিত করিল এবং তাহাকে স্তন্যদান করিতে করিতে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল।

বেহুলা সে রাত্রি আর ভেলা ভাসাইলেন না। সেই ঘাটেই ভেলা বাঁধিয়া প্রভাতের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কখন রাত্রি প্রভাত হইবে, বেহুলা উদ্বিগ্নভাবে কেবল সেই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে এক প্রহর, দ্বিপ্রহর করিয়া রাত্রি প্রভাত হইল। পূর্ব্বদিনের ন্যায় এ দিনও রজকিনী শিশু পুত্রটিকে প্রথমে স্তন্য দান করিয়া এবং পরে তাহাকে মারিয়া কাপড় কাঁচিতে প্রবৃত্ত হইল। সন্ধ্যাসমাগত হইলে রজকিনী যখন কাপড়ের মোট ও পুনর্জ্জীবিত শিশুটিকে লইয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিবে, তখন বেহুলা তাহার সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তাহার পদপ্রান্তে ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় পতিত হইলেন। রজকিনী তাঁহাকে হাতে ধরিয়া তুলিলেন। অতঃপর

বেহুলা তাঁহার দুরবস্থার কথা জ্ঞাপন করিলে রজকিনী তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া দেবলোকে লইয়া গেল। রজকিনী দেবতাদের কাপড় কাচিত, তাহার নাম ছিল "নেত"। বেহুলা নেতর নিকটে অনেক অনুরোধ করিয়া একখানি কাপড় ইতিপূর্ব্বে কাচিয়া দিয়াছিলেন, সেই কাপড়-খানি নেতর কাচা কাপড় হইতে উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। সে কাপড়-খানি স্বয়ং দেবাদিদের মহাদেবের। মহাদেব কখনও কাপড় পরিতেন না, দেবতাদের পীড়াপীড়িতে দুই একখানা কাচাইয়া রাখিতেন মাত্র। আজ কাপড় দেখিয়া তাঁহার মহা আহ্লাদ হইল, তিনি নেতকে বলিলেন, "হ্যা রে নেত! এ কাপড় কি তুই কাচিয়াছিস্?" নেত বলিল, "না, আমার এক ভগিনীর কন্যা আসিয়াছে, সেই-ই এই কাপড় কাচিয়াছে।"

মহাদেব বেহুলাকে দেখিতে চাহিলেন। নেত ইতিপূর্ব্বে বেহুলাকে প্রচ্ছন্নভাবে অন্যত্র রাখিয়া গিয়াছিল, এবার দেবসভায় উপস্থিত করিল। দেবতারা নেতর মুখে শুনিতে পাইলেন যে, তাহার ভগিনীর কন্যা নৃত্য-গীতে পরম পটু। এই কথা শুনিয়া দেবতারা বেহুলাকে নৃত্য-গীত করিতে বলিলেন। বেহুলা দেবতাদের অনুমতি লইয়া অপূর্ব্ব নৃত্য-গীতে তাঁহাদিগকে পরিতুষ্ট করিলেন। মহাদেব বেহুলার পরিচয় চাহিলেন, বেহুলা সজলনয়নে আপন পরিচয় দিয়া মৃত স্বামীর জীবন ভিক্ষা চাহিলেন। মহাদেব তখন মনসা দেবীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মনসা দেবী আসিয়া বলিলেন, "এই স্ত্রীলোকটির শ্বশুর গ্রামে গ্রামে বাড়ীতে বাড়ীতে আমার পূজা বন্ধ করিয়াছে, তাহার সকল পুত্রের জীবন লইয়াছি, সাতখানি ভরা নৌকা জলে ডুবাইয়াছি, তথাচ লোকটির চৈতন্যোদয় হয় নাই।" বেহুলা অতীব বিনয়ের সহিত মনসাদেবীর সকল কথা মানিয়া লইলেন এবং তাঁহার শ্বশুর ভবিষ্যতে আর কখনও তাঁহার (মনসা দেবীর) কোন প্রকার অসম্মান করিবেন

না, একথাও বলিলেন। তখন দেবগণের অনুরোধে মনসা দেবী বেহুলাকে তাহার স্বামীর মৃত কঙ্কালগুলি আনিতে বলিলেন। বেহুলা সেগুলি লইয়া গেলেন। মনসা দেবীর অনুগ্রহে লখিন্দর পুনর্জীবিত হইয়া উঠিলেন। ক্রমে বেহুলার প্রার্থনায় লখিন্দরের অন্য ছয় ভ্রাতা পুনর্জীবন লাভ করিলেন এবং সেই জল-নিমগ্ন নৌকা সাতখানির উদ্ধার-সাধন হইল। বেহুলা সেই সাতখানি তরী, ছয়টি ভাসুর ও নিজ পতিকে লইয়া চম্পাইনগরে উপস্থিত হইলেন। শ্বশুর-শাশুড়ী বহুকাল পরে মৃত পুত্রদিগকে দেখিয়া আনন্দে আত্ম-হারা হইলেন। চারিদিকে বেহুলার পাতিব্রত্যের জয়-জয়-ধ্বনি উত্থিত হইল। আপামর-সাধারণ সকলেই বুঝিল, এক মনে এক প্রাণে স্বামীর পদসেবা করিলে সে স্ত্রী মৃত স্বামীরও জীবন দান করিতে পারে। চাঁদ সদাগর তদবধি আর কখনও মনসা দেবীর অবমাননা করিতেন না, নিত্য তাঁহার বাটীতে মহাড়ম্বরে মনসা দেবীর পূজা হইত। তিনি অবশিষ্ট জীবন সাত পুত্র, সাত বধূ ও বহু পৌত্র-পৌত্রী লইয়া মহাসুখে কালযাপন করিয়াছিলেন।

বিদুলা

বিদুলা ছিলেন একজন ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভবা, তেজস্বিনী মহিলা। তিনি আপন ভোগ-বিলাসী পুত্র সঞ্জয়কে যুদ্ধে পাঠাইয়া দিয়া মাতৃত্বের এক জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। একদিন তিনি পুত্র সঞ্জয়কে শত্রু-হস্তে পরাজিত এবং শায়িত দেখিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "কাপুরুষ পুত্র এইভাবে শুইয়া থাকার চেয়ে তোমার মরণও মঙ্গল। এই ভাবে কাপুরুষের ন্যায় শুইয়া থাকিয়া তুমি যে জাতির ও তোমার বংশের মুখে চূণ-কালি দিতেছ! উঠ, উঠিয়া একবার শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, যদি তাহাতে তুমি পরাজিত হও, তাহা হইলেও লোকে তোমায় বীর বলিয়া চিরদিন স্মরণ করিবে। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া মরণই শ্রেয়ঃ, তথাচ কাপুরুষের ন্যায় জীবন ধারণ করা শ্রেয়ঃ নহে। আমি একশত কাপুরুষ পুত্র অপেক্ষা একটি বীর পুত্র দেখিলে প্রকৃত বীর-প্রসবিনী বলিয়া আত্মশ্লাঘা লাভ করিতে পারিব।" বলা বাহুল্য, জননীর এইরূপ উৎসাহ-বাক্যে উত্তেজিত হইয়া সঞ্জয় উঠিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

সাবিত্রী।

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্‌যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥

"স্ত্রীলোকের পতি বিনা যজ্ঞ নাই, পতির অনুমতি বিনা ব্রত নাই, কেবল মাত্র পতির সেবা করিলে স্ত্রীলোক স্বর্গলোকে গমন করেন।" এই কল্পনা আমাদের আর্য্যধর্ম্মেই প্রধানতঃ পাওয়া যায়, এবং এই কারণেই আমাদের শাস্ত্রকারগণ পতিব্রতার কর্ত্তব্য-মধ্যে ঐহিক ও পারলৌকিক শব্দদ্বয় সংযুক্ত করিয়াছেন। সতীত্বই আর্য্যপত্নীর শ্রেষ্ঠ সদ্‌গুণ। এই শ্রেষ্ঠ সদ্‌গুণের অধিকারিণী ছিলেন—সাবিত্রী।

পরপুরুষে অনাসক্তি এবং এমন কি মনেও পরপুরুষের চিন্তা না করাকেই সাধারণতঃ "সতীত্ব" আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু সাবিত্রীর সতীত্ব ইহা হইতে অনেক উপরে। সাবিত্রীর যখন বিবাহ হয় নাই, অর্থাৎ বিধিপূর্ব্বক কাহারও তিনি পত্নীপদে অভিষিক্তা হন নাই, সেই সময় হইতেই সাবিত্রী আপনার অলৌকিক সতীত্বের পরিচয় দিয়াছেন। সাবিত্রী মনে মনে আপন প্রাণ সত্যবানের পদে অঞ্জলি দিয়াছিলেন। সাবিত্রীর পিতা সত্যবানের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, সত্যবান অল্পায়ু; সুতরাং অচিরাৎ বৈধব্য-যন্ত্রণার ভয় দেখাইয়া তিনি সাবিত্রীকে সত্যবানের চিন্তা পরিহার করিতে বলিলেন, সাবিত্রী পিতার কথা শুনিয়া বলিলেন :—

"দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ুঃ সগুণো নির্গুণোঽপিবা।
সকৃদ্‌ বৃতো ময়া ভর্ত্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম্॥

মনসা নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো বাচাভিধীয়তে।
ক্রিয়তে কর্ম্মণা পশ্চাৎ প্রমাণং মে মনস্ততঃ॥"

"অর্থাৎ একবার আমি যাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তিনি অল্পায়ু হউন বা দীর্ঘায়ু হউন, গুণবান হউন বা নির্গুণ হউন, তিনি ব্যতীত আমি অন্য কাহাকেও বিবাহ করিব না। কোন কথা প্রথমে মনে নিশ্চয় হয়, পরে তাহা শব্দে ব্যক্ত হয়, তদনন্তর তাহা কার্য্যরূপে প্রকট হয়। এই কারণে আমার মনই এ কথার প্রমাণ।"

সাবিত্রীর উল্লিখিত বাক্যাবলি নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। লোকের মনে প্রকৃতই প্রথমে সদসৎ কামনা ও ভাবনার উদ্রেক হয়, তার পর তাহা কার্য্যে পরিণত হয়। নীতিশাস্ত্র বলেন, 'চুরি করিব' এ চিন্তা মনে স্থান দিলেও যে পাপ, কার্য্যতঃ চুরি করাতেও সেই পাপ। প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট না হইলেই যে তাহাতে পাপ হয় না, এমন কথা নীতিশাস্ত্র-বিগর্হিত। মনে পাপের বিকার উদ্ভব হইলেই তাহাতে পাপ হয়। যে বিবাহিতা স্ত্রী কখনও কোন পরপুরুষের সহিত প্রেম করে নাই, কিন্তু মনে কখনও কখনও পরপুরুষের চিন্তা স্থান দিয়াছে, শাস্ত্রমতে তাহাকেও পাপিনী বলে।

ইহা যে শুধু পবিত্র আর্য্যধর্ম্মের কথা, তাহা নহে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মেও এ কথার প্রতিধ্বনি করে। বাইবেল বলেন—"Whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart." অর্থাৎ যে কেহ পরস্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টিসহকারে তাকায়, সে ব্যভিচার-দোষে দুষ্ট হয়।

যে সময় সাবিত্রী আপন পিতাকে দ্বিতীয় বর অন্বেষণে বাধা দিয়াছিলেন, সে সময়ে তাঁহার বিবাহ হয় নাই। তথাপি সত্যবান ভিন্ন অন্য পুরুষের চিন্তা পর্য্যন্ত তিনি পাপ কার্য্য বলিয়া মনে

করিলেন। এই কারণেই সাবিত্রীর সতীত্ব অসাধারণ, অদ্বিতীয় ও অলৌকিক।

মহাভারত যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, সেই বৃহদায়তন গ্রন্থের কোথাও সাবিত্রী সত্যবানের প্রেমের কাহিনী বর্ণিত নাই। রামায়ণ-পাঠকমাত্রেই সীতার অসামান্য দুঃখ, ক্লেশ দেখিয়া শোকে ও দুঃখে অশ্রুধারা বর্ষণ করেন সত্য, কিন্তু তাহার কোথায়ও রাম-সীতার অবাধ অফুরন্ত প্রেমের বর্ণনা নাই। অথচ সাবিত্রী ও সীতা উভয়ই আদর্শ পতিপ্রেমিকা বলিয়া হিন্দু ললনাগণের শীর্ষস্থানীয়া—পূজনীয়া ও বরেণ্যা। ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, গভীর যে প্রেম তাহাতে চঞ্চলতা, বাচালতা, অধৈর্য্য ও অস্থিরতা নাই। অগাধ সমুদ্রের নিবাত নিষ্কম্প জলরাশির ন্যায় গভীর প্রেম স্থির, ধীর ও নিশ্চল। গভীর প্রেম উগ্র, উৎকট বা অনুত্তম নহে, পরন্তু স্নিগ্ধ, প্রশান্ত ও শীতল। প্রাচীন কালের কবিদিগের কাব্যে এইরূপ গভীর প্রেমের বর্ণন অধিকতর পাওয়া যায়।

শকুন্তলার সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইবার পর রাজা দুষ্মন্ত কিছুদিন কণ্বাশ্রমে অবস্থান করিবার পর রাজধানীতে ফিরিয়া যান। শকুন্তলা কয়েক বর্ষ পরে যখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন তখন দুষ্মন্ত তাঁহাকে আপন পত্নীরূপেই স্বীকার করিলেন না। এই কারণে শকুন্তলা বড় ক্লেশে পতিতা হইলেন।

রাজা দুষ্মন্তের মনে যখন পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাবলীর স্মরণ হইল তখন তিনি রাজার নিকটে কবে কোন্ লতাকুঞ্জে বসিয়া দুইজনে বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়া নানাপ্রকার প্রেমালাপ করিয়াছেন, কবে প্রস্ফুটিত কমলভ্রমে দুষ্ট ভ্রমর শকুন্তলার রক্তিম গণ্ডস্থলে অথবা বিম্বাধরে বসিতে চেষ্টা পাওয়ায় রাজা দুষ্মন্তের নাম করিয়াছিলেন এবং লতা-বিতানের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া রাজা তাহা দেখিতেছিলেন—এই সমস্ত

বিবৃত করিলেন। কিন্তু সাবিত্রীর প্রেম অন্তরূপ। মহাভারতকার বলিতেছেন :—

"প্রিয়বাদেন নৈপুণ্যৈঃ শমেন নিয়মেন চ।
রহশ্চৈবোপচারেণ ভর্ত্তারং পর্য্যতোষয়ৎ॥"

অর্থাৎ সাবিত্রী আপন প্রিয় সম্ভাষণ, নিপুণতা, শান্তি ও একান্ত সেবা দ্বারা পতিকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন।

মহাভারতকার এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। গভীর প্রেমে প্রেমচেষ্টা স্বাভাবিকতঃ অল্পই থাকে, আর যাহা কিছু থাকে তাহাও গুপ্ত থাকে। প্রেমের গভীরতার গুণ প্রতিপাদন করিবার জন্য প্রেম-চেষ্টার বর্ণন করিবার আবশ্যকতা মহাকবির দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। সাবিত্রীর পতিপ্রেমের অপূর্ব্ব চিত্র মহাভারতে নিম্নলিখিত প্রকারে অঙ্কিত হইয়াছে :—

"আপন পতির বিধিলিখিত মৃত্যু লঙ্ঘন করিবার জন্য সাবিত্রী উগ্রব্রতাচরণ আরম্ভ করিলেন এবং তিন দিন নির্জ্জল উপবাস করিয়া তিনি স্বামীর সহিত বনে গেলেন। বনে সাবিত্রীর ক্রোড়োপরি মস্তক রাখিয়া সত্যবান মৃতবৎ পড়িয়া রহিলেন। স্বয়ং যমরাজ সত্যবানের প্রাণ হরণ করিবার জন্য আসিলেন। অমানুষিক প্রযত্নের দ্বারা সাবিত্রী আপন পতির প্রাণ যমের হাত হইতে রক্ষা করিলেন। তিন দিন তিন রাত এক বিন্দু জল পেটে না পড়ায় সতী সাধ্বী সাবিত্রীর বড়ই গ্লানি হইতে লাগিল। তিনি বনের ভীষণতা-দর্শনে ভয়ভীতা হইয়া স্বামীকে বলিলেন :—

"অস্মিন্নস্য বনে দগ্ধে শুষ্কবৃক্ষ স্থিতো জ্বলন্।
বায়ুনা ধুন্যমানোঽত্র দৃশ্যতেঽগ্নিঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ॥
ততোঽগ্নিমানয়িত্বেহ জ্বালয়িষ্যামি সর্ব্বতঃ।
কাষ্ঠানীমানি সংতীহ জহি সন্তাপমাত্মনঃ॥

যদি নোৎসহসে গন্তুং সরুজং ত্বাং হি লক্ষয়ে।
ন চ জানামি পন্থানং তমসা সংবৃতে বনে॥
শ্বঃ প্রভাতে বনে দৃশ্যে যাস্যাবোঽনুমতে তব।
বসাবেহ ক্ষপামেকাং রুচিতং যদি তেঽ নঘ।

হে অনঘ! আপনাকে কিঞ্চিৎ ব্যথিত দেখা যাইতেছে। বিশেষতঃ অন্ধকারে এই বন আচ্ছাদিত হওয়ায় পথ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, যদি আপনার ইচ্ছা হয় তবে আজিকার রাত্রি এখানে বিশ্রাম করি। এই বনে কোন কোন শুষ্ক বৃক্ষ বায়ুপ্রবাহে প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, ঐ বৃক্ষ হইতে অগ্নি আনিয়া আমি এইস্থানে জ্বালিব, আপনি চিন্তা করিবেন না।"

পরন্তু সত্যবানের প্রাণ এই সময় আপন মাতাপিতার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি বলিলেন, "সায়ংকালের পর আমার মাতা আমাকে কখনও ঘরের বাহির হইতে দেন না; এমন কি, দিনের বেলাতেও তাঁহার দৃষ্টির অন্তরাল হইলে তিনি বিশেষ চিন্তান্বিতা হইয়া পড়েন। হে সাবিত্রি! আমার মাতাপিতা উভয়ই বৃদ্ধ। উহাদের একমাত্র অবলম্বন আমি। যদি রাত্রি বেলায় তাঁহাদের সমীপে আমি না যাই তবে তাঁহাদের কি দশা হইবে?" এই কথা বলিয়া সত্যবান দুই হাত তুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; তাহা দেখিয়া সাবিত্রী বলিলেন;—

"যদি মেঽস্তি তপস্তপ্তং যদি দত্তং হুতং যদি।
শ্বশ্রূশ্বশুর ভর্ত্তৃণাং মম পুনস্ত্বাস্ত শর্বরী॥
ন স্মরাম্যুক্ত পূর্ব্বং বৈ স্বৈরেষপ্য নৃতাং গিরম্।
তেন সত্যেন তাবদ্যাদ্ধ্রিয়েতাং শ্বশুরৌ মম॥

অর্থাৎ আমি কখনও যদি কোন তপ, দান, হবনাদি করিয়া থাকি, তবে তাহার পুণ্যফলের জন্য আজ রাত্রি আমার শ্বশুর ও পতির পক্ষে

কল্যাণজনক হোক। আমি যদি আমোদ-প্রমোদেও কখনও মিথ্যা কথা না বলিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই পুণ্যফলে আজ আমার শ্বশুর-শাশুড়ী জীবিত থাকুন।”

ধর্ম্মরূপিণী পতিব্রতার ধর্ম্মবলের উপর এইরূপই বিশ্বাস ছিল। এতদ্ব্যতীত সাবিত্রী যমরাজের নিকট হইতে বর প্রার্থনা করিয়া লইয়াছিলেন, তাহাতেও সাবিত্রীর অকাট্য বিশ্বাস ছিল। তিনি ভাবিলেন, স্বয়ং যমরাজ যখন অভয় দিয়াছেন তখন আজ রাত্রে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন না করিলেও আমার স্বামীর কোন বিপদ হইবে না। কিংবা আমার শ্বশুর-শাশুড়ীরও কোন অমঙ্গল হইবে না। সত্যবান পুনরায় বলিলেন :—

“কাময়ে দর্শনং পিত্রোর্যাহি সাবিত্রী মাচিরম্।
পুরা মাতুঃ পিতুর্বাপি যদি পশ্যামি বিপ্রিয়ম্।
ন জীবিষ্যে বরারোহে সত্যেনাত্মান মালভে।
যদি ধর্ম্মে চ তে বুদ্ধি র্মা চে জীবন্তমিচ্ছসি॥
মম প্রিয়ং বা কর্ত্তব্যং গচ্ছাব আশ্রমন্তিকাৎ।

“সাবিত্রি! মাতা পিতার সহিত মিলিত হইবার প্রবল উৎকণ্ঠা আমার মনে জাগিতেছে। এই কারণে তুমি বিলম্ব করিও না। হে বরারোহে! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি মাতা-পিতার কোন অমঙ্গল হয়, তবে আমি ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকিব না। এই কারণে যদি ধর্ম্মে তোমার মতি থাকে এবং আমি জীবিত থাকি যদি ইহা তোমার ইচ্ছা হয় অথবা আমার হিতকামনা করা তোমার কর্ত্তব্য হয়, তবে এখনই চল—বিলম্ব করিও না।”

পতির কথা শুনিয়া সাবিত্রী তৎক্ষণাৎ শ্বশুরালয়াভিমুখে স্বামি-সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন।

আমাদের প্রাচীন মহাকবিগণ এই প্রকার প্রেম-চিত্র অঙ্কিত

করিয়াছেন। আজকাল যে সকল নবীন কবি প্রেমিক-প্রেমিকার মুখে হাস্যের লহর, বাহ্যাড়ম্বরের নির্ঝরিণী এবং দীর্ঘঃনিশ্বাস, হা-হুতাশ, মূর্চ্ছা ইত্যাদি চিত্র অঙ্কন করিতেছেন, প্রাচীন মহাকবিদের কাব্যে সেরূপ ছিল না।

স্বধু পতিকে ভালবাসিলেই পাতিব্রত্য ধর্ম্ম আচরণ করা হয় না, পতি যে বস্তু ভালবাসেন, পতির যাহা শ্রেয়ঃ সেই বস্তুর প্রতি অকাট্য শ্রদ্ধা ও ভক্তিকে পাতিব্রত্য বলে। যে স্ত্রীলোক আপন পতিকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করেন, কিন্তু শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, ননদ প্রভৃতিকে তাদৃশ ভক্তি করেন না তাহাকে পতিব্রতা নারী বলা যায় না।

সত্যবানের সহিত বিবাহ হইলে সাবিত্রী এক বৎসর পরেই বিধবা হইবেন, একথা তিনি নারদের মুখ হইতে শুনিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি তাহাতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত বা ব্যথিত না হইয়া আপন প্রারব্ধ ফল ভোগ করিতে স্বীকার করিলেন। পিতা বলিলেন, “সাবিত্রি! তুমি রাজসংসারে চিরদিন সুখের ক্রোড়ে লালিতা পালিতা হইয়া কেমন করিয়া পর্ণশালায় বাস করিবে?” পিতার কথা শুনিয়া সাবিত্রী উত্তর করিলেন “যেখানে পতি থাকেন সেই আমার প্রাসাদ। পতির গৃহকর্ম্ম করিতে আমি একটু ক্লেশ বোধ করিব না।” এই কথা বলিয়া সাবিত্রী সত্যবানের পতীত্ব স্বীকার করিলেন।

শ্বশুরালয়ে যাইবার পর সাবিত্রী অহোরাত্র কেবল নারদের ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করিতেন। দিন গণনা করিতে করিতে অবশেষে সত্যবানের কালপ্রাপ্তির সময় নিকটবর্ত্তী হইল। সত্যবানের মৃত্যুর তিন দিন মাত্র আছে, সাবিত্রী অন্নজল পরিত্যাগ করিয়া কি করিয়া স্বামীর প্রাণ রক্ষা করিবেন, এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। সাবিত্রীর কঠোর ব্রত দেখিয়া শ্বশুর বলিলেন “মা, তুমি এইরূপ কঠোর ব্রত করিয়া নিজেই যে মারা যাইবে।” সাবিত্রী শ্বশুরকে অতি বিনীত-

ভাবে বলিলেন, "আমার জন্য কোন চিন্তা করিবেন না, আমি নিশ্চয়ই এই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে সক্ষম হইব।"

সত্যবান মৃত্যু-দিন কুঠার লইয়া বনে কাষ্ঠ ছেদনের জন্য যাত্রা করিলেন। সাবিত্রী শ্বশুরের আজ্ঞা লইয়া সত্যবানের পশ্চাদনুসরণ করিলেন। পথে যাইতে যাইতে সত্যবান সাবিত্রীকে বনের অসামান্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখাইলেন। হায়! হতভাগ্য সত্যবান জানিত না যে, তাহার সকল আশার যবনিকা পতন হইতে যাইতেছে! সত্যবান সাবিত্রীকে বনের শোভা দেখাইতেছেন, কিন্তু সাবিত্রীর কি সেদিকে মন আছে? এতদিন ধরিয়া তিনি মনের অতি নিভৃত প্রান্তে মৃত্যু-বিভীষিকার যে ভীষণ প্রতিমূর্ত্তি কল্পনা করিতেছিলেন, আজ তাহা বাস্তব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার ইহকাল ও পরকালের অবলম্বন—তাঁহার জীবন-মরণের সঙ্গীকে গ্রাস করিতে আসিতেছে! কিন্তু তবুও সেই সাধ্বী পতির মনোরঞ্জনের জন্য তাঁহার সহিত প্রফুল্ল-চিত্তে বাক্যবিনিময় করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন—তাঁহার মনের কষ্ট ফল্গু-প্রবাহে মনের ভিতর দিয়াই প্রবাহিত হইতে লাগিল।

কাঠ কাটিতে কাটিতে অকস্মাৎ সত্যবানের শিরঃপীড়া উপস্থিত হওয়ায় তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। সাবিত্রী তৎক্ষণাৎ পতির মস্তক আপন উরুদেশে স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, দিব্যবসন-পরিহিত, মুকুটধারী এক তেজস্বী পুরুষ সত্যবানের নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সাবিত্রী উহাকে দেখিয়াই ভয়ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি ধৈর্য্যধারণ করিয়া স্বামীর মস্তক ধীরে ধীরে ভূমিতে রাখিয়া করজোড়ে সেই তেজস্বী পুরুষকে বলিলেন—"আপনি কে? কি কারণে আপনি এখানে আসিয়াছেন?" সাবিত্রীর প্রশ্ন শুনিয়া যমরাজ যে উত্তর দিলেন তাহাতে সাবিত্রী ভীত

ও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। যমরাজ সত্যবানের সূক্ষ্মদেহ হইয়া চলিয়া গেলেন, সাবিত্রীও যমরাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন।

যমরাজ তখন সাবিত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"সাবিত্রী! মনুষ্য এই পর্য্যন্ত আসিতে পারে, ইহার অতিরিক্ত মানুষের আসিবার শক্তি নাই। তুমি পশ্চাৎ ফিরিয়া যাইয়া পতির অন্তিম কার্য্য কর, তুমি পতির ঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছ।"

পতির ঋণ-পাশ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, সাবিত্রীর এরূপ বিশ্বাস হইল না, তিনি যমরাজকে বলিলেন, "তপশ্চরণ, গুরুজনের সেবা, ব্রত ও আপনার কৃপায় আমার গতি অপ্রতিবন্ধ হইবে। আপনি আমাকে পশ্চাতে হটাইতে পারিবেন না।"

সাবিত্রীর উল্লিখিত কথা শুনিয়া এবং তাঁহার অকৃত্রিম পাতিব্রত্যের পরিচয় পাইয়া যমরাজ বলিলেন, "আমি তোমাকে সত্যবানের প্রাণভিক্ষা ব্যতীত অন্য যে কোন বর চাহ, তাহা দিতে সম্মত আছি।" সাবিত্রী বলিলেন, "পতির প্রাণ অপেক্ষা আমার কি প্রার্থনীয় থাকিতে পারে?" এই বলিয়া তিনি ধর্ম্মরাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। একে ত সারা বৎসর দুশ্চিন্তায় ম্রিয়মাণা, তদুপরি তিনদিন তিনরাত্রি নিরম্বু উপবাস, সাবিত্রীর দেহে আর কত সহে? তিনি তবুও যমরাজের পিছু পিছু চলিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ সাবিত্রীকে বারম্বার ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন কিন্তু সেই সতী সাধ্বী দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিলেন, "যতক্ষণ স্বামীর আত্মার নিকটে আমি আছি, ততক্ষণ আমার কোনই ক্লেশ নাই। আমার স্বামীর যে গতি হইয়াছে, আমারও সেই গতি হইবে।"

সাবিত্রীর ক্লেশ দেখিয়া যমরাজের হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হইল, তিনি আবার বলিলেন,—"তুমি ফিরিয়া যাও।" সাবিত্রী দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—"ন দূরমেতন্মম ভর্ত্তৃসন্নিধৌ মনো হি মে দূরতরং প্রধাবতি।"

সাবিত্রীর এই কথা শুনিয়া যমরাজ বলিলেন—“সাবিত্রি, তোমার বলবীর্য্যশালী পুত্র হৌক, এখন তুমি চলিয়া যাও।” যমরাজের বর শুনিয়া সাবিত্রীর এবার অতি দুঃখেও হাসি আসিল। তিনি ধর্ম্মরাজকে বলিলেন, “আপনি আমাকে ‘পুত্রবতী হও’ বলিয়া বর দিতেছেন, বেশ আপনার বচন যেন সত্য হয় এবং আমার পতি যেন জীবিত হন।”

সত্যবান পুনর্জীবিত হইলেন—সাবিত্রী পতির পদধূলি লইয়া ধন্যা হইলেন—যমরাজও এক জ্বলন্ত সতীর চিত্র অন্তরে লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কতদিন হইল সতী, পতি-প্রেমবতী, পতিব্রতা সাবিত্রী ইহলোক হইতে যাত্রা করিয়াছেন, কিন্তু আজিও তাঁহার পুণ্যস্মৃতি হিন্দুকুল-কামিনীকুলের হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। যেদিন বঙ্গের ঘরে ঘরে সাবিত্রীর জ্বলন্ত মূর্ত্তি দৃষ্ট হইবে, সেই দিনই জানিব যে, বাঙ্গালায় আবার পুরাতন গৌরব-বন্যা ফিরিয়া আসিয়াছে।

লীলাবতী

লীলাবতী প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী পণ্ডিত ভাস্করাচার্য্যের কন্যা। পিতার একমাত্র কন্যা বলিয়া ইনি পিতার নিকট পরম যত্নে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। ইনি জ্যোতিষ ও গণিতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। লীলাবতী যে বিবাহের পর বিধবা হইবেন, ইহা ভাস্করাচার্য্য জ্যোতিষ-বলে জানিতে পারিয়াছিলেন, জানিতে পারিয়া তিনি শুভ লগ্নে কন্যার বিবাহ দিবেন স্থির করেন। কিন্তু কি ভাবে শুভলগ্ন স্থির করিবেন? তিনি একটি জলপাত্রের তলদেশে ছিদ্র করিয়া তাহা জলের উপর ভাসাইয়া দেন। স্থির হইল, সেই পাত্র পরিপূর্ণ হইলেই শুভলগ্ন উপস্থিত হইবে। লীলাবতী আপন মুখ নত করিয়া পাত্রটি দেখিতেছিলেন, তখন তাঁহার মাথার মুকুটস্থিত একটি মুক্তা পাত্রটির মধ্যে পতিত হওয়ায় পাত্রটি আর জলপূর্ণ হয় না। বহুক্ষণ পাত্রটি জলের উপর রাখিয়া দিলেও যখন উহা পরিপূর্ণ হইল না, তখন ভাস্করাচার্য্য পাত্রটির মধ্যে তাকাইয়া দেখিলেন যে, পাত্র মধ্যে একটি মুক্তা পড়িয়া রহিয়াছে। তখন ভাস্করাচার্য্য নিতান্ত বিষণ্ণ অন্তরে বলেন, মানুষ যতই চেষ্টা করুক, ভবিতব্যের হাত হইতে তাহার কখনই নিস্তার নাই—ভাগ্যে যাহা আছে তাহা ঘটিবেই ঘটিবে। সত্যও তাহাই হইল। ভাস্করাচার্য্য কন্যার বিবাহ দিলেন বটে, কিন্তু অল্প-দিনের মধ্যেই একমাত্র দুহিতার বৈধব্য-বেশ তাঁহাকে দেখিতে ও ভাবী জীবনে বৈধব্য-যন্ত্রণার ক্লেশ তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইল। কিন্তু লীলাবতী বৈধব্যকে বৈধব্য বলিয়া মনে করিতেন না। সে সময়ে সমাজের আদর্শ—বিধবাদের জীবনযাপনপ্রণালী এত সুন্দর এত

পবিত্র ছিল যে, বিধবাগণ মনের তৃপ্তিতেই দিনযাপন করিতেন এবং সন্ধ্যা, আহ্নিক, তপঃ, জপ, ব্রত ও আচার-অনুষ্ঠানে তাঁহাদের দিন কাটিত।

বিধবা অবস্থায় লীলাবতী পিতৃসকাশে থাকিয়া জ্যোতিষ-তত্ত্বের অনুশীলন করিতেন। তিনি পিতাকে দুরূহ গণিতের সমাধানে সাহায্য করিতেন। ভাস্করাচার্য্য সিদ্ধান্ত শিরোমণি নামক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে লীলাবতী নামে এক পাটীগণিত সংযোজিত করেন। অনেকের বিশ্বাস, এই পাটীগণিত লীলাবতী-রচিত। পিতা প্রশ্ন করিতেছেন, আর কন্যা লীলাবতী তাহার উত্তর দিতেছেন, "সিদ্ধান্তশিরোমণি" এইরূপ প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লেখা। স্মৃতির অতীত যুগেও ভারতবর্ষে বিদূষী মহিলার অভাব ছিল না, লীলাবতী তাহার পরিচয়।

শাণ্ডিলী

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির শরশয্যাগত পিতামহ ভীষ্মের নিকট সতীধর্ম্ম শুনিতে চাহিলে ভীষ্ম তাঁহার নিকট নিম্নলিখিত গল্পটি করিয়াছিলেন :—

"সুমনা নামে কোনও মহিলা পুণ্যবলে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। তিনি অমরলোকে গিয়া দেখিলেন শাণ্ডিলী নামে এক নারী স্বর্গের অত্যুচ্চপদ অধিকার করিয়াছেন। শাণ্ডিলী জ্যোতির্ম্ময় দিব্যবসন পরিধান পূর্ব্বক জ্বলন্ত দেবযানে আরোহণ করিয়া আপন পুণ্যতেজে দেবলোককে দ্বিগুণ আলোকিত করিয়া অপ্রতিহতপ্রভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছেন। সুমনা তাঁহার তাদৃশ ঐশ্বর্য্য-দর্শনে বিস্মিত হইয়া একদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্য্যে! আপনি কি পুণ্য করিয়া এ ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়াছেন? আপনি মর্ত্তলোকে কি তপস্যা করিয়া আসিয়াছেন, তাই সুরলোকে এ সম্পদ ভোগ করিতেছেন? আপনার এ অসামান্য পদ কখনও সামান্য পুণ্যের ফল নহে।"

সুমনার কথা শুনিয়া শাণ্ডিলী মৃদুহাস্যসহকারে বলিলেন— "ভগিনী!" আমি মর্ত্ত্যলোকে যে ব্রতপালন করিয়াছি, তজ্জন্য আমাকে রক্তবস্ত্রও পরিধান করিতে হয় নাই, অথবা বল্কলও ধারণ করিতে হয় নাই। আমি মস্তকও মুণ্ডন করি নাই, জটাও বন্ধন করি নাই, তীর্থে তীর্থেও ভ্রমণ করি নাই, কিংবা উপবাসেও শরীর শুষ্ক করি নাই। আমি গৃহস্থাশ্রমে কয়েকটি অতি সহজ নিয়ম পালন করিয়াছি, তাহাতেই এই স্বর্গরাজ্যে আসিতে পারিয়াছি। আমি স্বামীকে কদাচ অহিতকর অথবা অপ্রিয় কথা বলি নাই, আমি সমাহিতচিত্তে দেবতা, অতিথি, পিতৃলোক ও সাধুগণের পূজা করিয়াছি, পরমভক্তিভরে শ্বশুর,

শাশুড়ী ও অন্যান্য গুরুজনের সেবা করিয়াছি, পরিজন ও ভৃত্যাদির প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ ও প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছি, কখনও শঠতা করি নাই, আহার্য্যবিষয়ে অধিক লোভ করি নাই, অযথাস্থানে গিয়া দণ্ডায়মান হই নাই, গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে কুৎসিত কার্য্যে কখনও আমার প্রবৃত্তি হয় নাই, কখনও নিলর্জ্জভাবে হাস্য-পরিহাস করি নাই। আমার স্বামী স্থানান্তর হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলে আমি তৎক্ষণাৎ অন্য কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া তাঁহাকে পবিত্র আসনে বসাইয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতাম। স্বামী যে যে দ্রব্য অভিলাষ করিতেন না, যে ভক্ষ্য অথবা ভোজ্য পানীয় ভালবাসিতেন না, আমিও সেসকল পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। অতি প্রত্যূষে উঠিয়াই আমি গৃহ-কর্ম্মে নিযুক্ত হইতাম, পতি কোন কার্য্যে বিদেশে যাইলে আমি তাঁহার মঙ্গলার্থে বিবিধ মঙ্গল-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতাম এবং সর্ব্বদা সাবধানে ও সংযতভাবে তাঁহার প্রিয় ও হিতকর কার্য্যে নিবিষ্ট থাকিতাম। পতির অনুপস্থিতিকালে গন্ধ, মাল্য, অনুলেপন, বেশভূষা প্রভৃতি ভোগ্য দ্রব্য স্পর্শও করিতাম না। কদাচ তাঁহাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে দিতাম না। তাঁহার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও শান্তির প্রতি সদাই দৃষ্টি রাখিয়া চলিতাম। গোপনীয় বিষয় কদাপি প্রকাশ করিতাম না। এইসমস্ত কারণে বোধ হয় আমি এই স্বর্গসুখের অধিকারিণী হইয়াছি।”

আত্রেয়ী

গার্গী, মৈত্রেয়ী ও লোপামুদ্রার ন্যায় আত্রেয়ীও প্রাচীন ভারতের একজন বিদুষী মহিলা। তাঁহার এতদূর জ্ঞান পিপাসা ছিল যে, তিনি বহুদূর স্থান পদব্রজে অতিক্রম করিয়া বাল্মীকির তপোবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট কিছুদিন শাস্ত্রশিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু অধিক-দিন তাঁহার ভাগ্যে এই প্রকার শিক্ষালাভ ঘটিয়া উঠে নাই। মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে সীতাদেবী অবস্থান করিতেন, লক্ষ্মণ তাঁহাকে তথায় অন্তর্ব্বত্নী অবস্থায় রাখিয়া আসিবার পর হইতেই মহর্ষি তাঁহাকে কন্যার ন্যায় লালন-পালন করিতেছিলেন। এই সীতাদেবীর গর্ভে লব ও কুশ নামে দুইটি অনিন্দ্যসুন্দর সন্তান জন্মগ্রহণ করে। বাল্মিকী লব ও কুশের অসাধারণ স্মৃতি ও মেধা দর্শনে তাঁহাদিগকে অত্যন্ত যত্নসহকারে রামায়ণ হইতে বেদাদি শাস্ত্র সমস্ত পড়াইতে থাকেন। ফলে আশ্রমে আর যেসমস্ত ছাত্র ও ছাত্রী ছিল, তাহারা গুরুদেবের নিকট শিক্ষালাভের আর কোন সুযোগ না দেখিয়া একে একে স্বস্থানে প্রস্থান করেন। আত্রেয়ীকেও হতাশায় মহর্ষির আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হয়। তিনি পদব্রজে নানাস্থান অতিক্রম করিয়া অবশেষে দক্ষিণ ভারতে উপস্থিত হন। দক্ষিণ ভারত তখন বেদ-উপনিষদের সুমধুর ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত। প্রাতঃকাল হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত অযুত বিদ্যার্থী মধুর নাম-ঝঙ্কারে সমস্ত আশ্রম ও তপোবন মুখর করিয়া তুলিত। আত্রেয়ী নানাস্থান পর্য্যটন করিতে করিতে অবশেষে সুপ্রসিদ্ধ ঋষি অগস্ত্য ঋষির আশ্রমে উপনীত হন। অগস্ত্য ঋষি এই জ্ঞানার্থিনীকে পাইয়া পরম পুলকিত হন। মনে মনে ভাবেন, এ

নারী নিতান্ত সামান্য নারী নহে, যদি সামান্যা হইবে তবে কি সুদূর বাল্মীকি-আশ্রম হইতে এই দক্ষিণ ভারতে জ্ঞানান্বেষণের জন্য আসেন? তিনি আপন দুহিতার ন্যায় আত্রেয়ীকে নিজ সকাশে রাখিয়া তাঁহাকে উপনিষদাদি নানা শাস্ত্র শিক্ষা দেন। আত্রেয়ী কোন পুস্তকাদি লেখেন নাই, কিন্তু তথাচ তিনি যে একজন জ্ঞান-পিপাসু বিদুষী রমণী ছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বহুদিন হইল, আত্রেয়ী এই মরজগৎ ত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি তাঁহার কীর্ত্তিগাথা লোকমুখে বিঘোষিত হইতেছে।

মৈত্রেয়ী

সে সত্য যুগের কথা। সেই যুগে মৈত্রেয়ী নামে এক বিদুষী মহিলা ছিলেন। তাঁহাকে শুধু বিদুষী বলিলে তাঁহার অবমাননা করা হয়। তিনি যেমন বিদুষী তেমনি ধর্ম্মপরায়ণাও ছিলেন। সর্ব্বদা ভগবানের জন্য তাঁহার প্রাণ উন্মুখ হইয়া থাকিত। তাঁহার পিতার নাম ছিল মিত্র। মিত্রের কন্যা বলিয়া তাঁহাকে মৈত্রেয়ী বলিত। মিত্র একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। মিত্র কন্যারত্ন মৈত্রেয়ীকে লেখাপড়া শিখাইতে ত্রুটি করেন নাই; তাঁহার প্রযত্নে মৈত্রেয়ী সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। "কন্যাপ্যেবঃ পালনীয়া শিক্ষণীয়াঽতি যত্নতঃ" ইহাই ত শাস্ত্রের বাণী। যেমন পুত্রকে তেমনই কন্যাকেও লেখাপড়া শিখাইতে হয়, ইহাই ছিল তখনকার লোকের দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁহারা শাস্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন, কাজেই তাঁহাদের দ্বারা শাস্ত্রবাক্য কখনই লঙ্ঘন হইত না। তাই তাঁহারা ছেলেকে যেমন শিক্ষা দিতেন, তেমনই মেয়েকেও শিক্ষা দিতেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেয়ীর জ্ঞানবত্তার পরিচয় আছে, তাহা পড়িলে জানা যায়, মৈত্রেয়ী দর্শনশাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিতা ছিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে রাজা, মহারাজা বা ধনীর সহিত বিবাহ দেন নাই—দিয়াছিলেন মহাজ্ঞানী মহর্ষি পণ্ডিত যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত।

উপযুক্ত স্বামী পাইয়া মৈত্রেয়ী জীবনকে ধন্য ও কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরমানন্দে দিন কাটিত—স্বামী স্ত্রীতে জটিল দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা করিয়া মৈত্রেয়ী প্রশ্ন করিতেন, কোন দিন বা যাজ্ঞবাল্ক্য একটি প্রশ্ন করিতেন, আর মৈত্রেয়ী উহার প্রত্যুত্তর

দিতেন। কোন কোন দিন মৈত্রেয়ীর নিকট যাজ্ঞবাল্ক্য পরাজয় স্বীকার করিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া স্বামীর প্রতি মৈত্রেয়ীর তিলমাত্র অশ্রদ্ধা জন্মিত না। উষাকালে পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যোদয় হইবার পূর্ব্বেই শুচি-স্নাতকলেবরে মৈত্রেয়ী ফুলের সাজি লইয়া পুষ্প চয়ন করিয়া স্বামীর পূজার আয়োজন করিয়া দিতেন, নিজ হাতে নীবার ধান্যের ভাত রাঁধিয়া তাহা সযত্নে স্বামীকে দিতেন। তিনি স্বামীর সুখ-দুঃখের সমানভাগিনী ছিলেন।

যাজ্ঞবল্ক্যকে সকলেই মহর্ষি বলিত। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ঋষি। তখন চতুরাশ্রমের ব্যবস্থা ছিল। বার বৎসর পর্য্যন্ত ছেলেরা গুরুর আশ্রমে থাকিয়া শিক্ষালাভ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিত। তার পর অনাসক্তভাবে সংসারধর্ম্ম পালন করিয়া তাঁহারা প্রথমে সন্ন্যাস ও পরে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতেন। যাজ্ঞবল্ক্য সংসার-ধর্ম্ম পালন করিবার পর সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে মনস্থ করিলেন। সে জন্য তিনি মৈত্রেয়ীর ও অন্য পত্নী কাত্যায়নীর অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। মৈত্রেয়ী তাহা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে অনুমতি দিয়া বলিলেন, 'স্বামিন্, আপনি সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করবেন, এর চেয়ে আর সুখের কি আছে?'

তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "আচ্ছা তবে এখন তোমাদের দু'জনের মধ্যে আমার যা' কিছু বিষয়-সম্পত্তি আছে তাহা ভাগ করিয়া দিতেছি।" মৈত্রেয়ী তাহা শুনিয়া বলিলেন, "দেব, 'সস্ত্রীক্ ধর্ম্মমাচরেৎ', ইহাই ত শাস্ত্রের কথা, আপনি যদি আমাকে এত ভালবাসেন, তবে আপনি কেন আমাকে আপনার সাধনার অংশভাগিনী করিতেছেন না?' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'দেখ মৈত্রেয়ী, এই সন্ন্যাসের পথ অতি কঠোর ও কষ্টের পথ, এ পথে যেতে গেলে অনেক ত্যাগ, অনেক সংযম প্রয়োজন!'

মৈত্রেয়ী বলিলেন, 'মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যার স্বামী, তার কি কঠোর

জীবনে ,ভয় ? আর এই যে সব বিষয় ঐশ্বর্য্য ইহাতে কি আমি ভগবানকে লাভ করিতে পারিব ?'

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'তা কেন পাইবে মৈত্রেয়ী ! সাংসারিক বিষয়-সম্পদে কেহ কি কখনও ভূমা আনন্দ পেতে পারে ? সে আনন্দলাভ করতে গেলে এ সংসারের মোহ ছাড়তে হয়।'

তখন মৈত্রেয়ী বলিলেন, "যেনাহং নামৃত স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাঃ" —যার দ্বারা আমার অমৃতত্ব লাভ না হইবে সেই বিত্ত লাভ করিয়া আমি কি করিব ?"

যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীর ধর্ম্মসাধনায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া তাঁহাকে আপনার সন্ন্যাস-জীবনের সঙ্গিনী করিলেন। "অর্দ্ধ ভার্য্যা পুরুষস্য"— ইহা কি যাজ্ঞবল্ক্য ভুলিতে পারেন ? তদবধি যাজ্ঞবল্ক্যের দেহত্যাগ পর্য্যন্ত মৈত্রেয়ী তাঁহার জীবন-সঙ্গিনী ছিলেন।

বিশ্ববারা

ভারতবর্ষ স্বর্ণভূমি—বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী। ভারতের অপৌরুষেয় বেদ সকল শাস্ত্রের—সকল বিদ্যার আধার। এই বেদের সূক্তসমূহ যে কেবল শাস্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণই রচনা করিতেন তাহা নহে, বিদুষী রমণীগণও সে রচনার অংশ গ্রহণ করিতেন। এইরূপ বিদুষীগণের রচিত সূক্ত এখনও বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীন কালে যখন অন্যান্য দেশের অধিবাসিগণ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায়ুধ বন্য জন্তুর ন্যায় বিচরণ করিত, যখন তাহাদের স্ত্রীলোকেরা ত দূরের কথা, পুরুষেরা পর্য্যন্ত লৌহ প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার জানিত না, তখন এই ভারতবর্ষের শান্ত-স্নিগ্ধ তপোবনে নীবার-ভোজী ঋষি-মুনিগণের ঔরসে এরূপ সমস্ত বিদুষী দুহিতা জন্মগ্রহণ করিতেন, যাঁহারা দুরূহ বেদের সূক্ত পর্য্যন্ত রচনা করিতে পারিতেন। বিশ্ববারা ইঁহাদের মধ্যে একজন। বিশ্ববারা অত্রি মুনির গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঋগ্বেদ-সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের দ্বিতীয় অনুবাকের অষ্টাবিংশ সূক্ত রচনা করেন। বিশ্ববারা যে সূক্ত রচনা করেন তাহাতে ছয়টি ঋক্ আছে। প্রত্যেক ঋক্‌গুলি ভাব ও ভাষায় অতুলনীয়। ইহা দ্বারা বিশ্ববারা যে কত বড় বিদুষী ছিলেন তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

দেবহুতি

দেবহুতি রাজা স্বয়ম্ভুব মনুর কন্যা ছিলেন। পিতার অতুল বিভব ও সম্পত্তি, রাজৈশ্বর্য্য কোন কিছুতেই তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইত না। তাঁহার প্রাণে অগাধ জ্ঞানপিপাসা ছিল। তাই তিনি রাজকন্যা হইয়াও মহাজ্ঞানী কর্দ্দম ঋষিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কর্দ্দম ঋষি বনে বাস করিতেন। তাঁহার আবাসের মধ্যে ছিল একখানা কুটীর। আর ছিল একটি মৃণ্ময় কলস। ইহা সত্ত্বেও দেবহুতি রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া স্বামীর সহিত বনে গমন করিয়াছিলেন। স্বামী কর্দ্দম ঋষিও অবিবেচক ছিলেন না, পত্নীর অদম্য জ্ঞানপিপাসা-দর্শনে তিনি মোহিত হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বদা নানা শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। সে কি মধুর দৃশ্য! নির্জ্জন অরণ্যের মধ্যে দেবহুতির কুটীর, সেই কুটীরে এক মৃণ্ময়-প্রদীপের আলোকে কুশাসনে বসিয়া কর্দ্দম ঋষি পত্নীকে শিক্ষা দান করিতেছেন, আর ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় স্বামীর পদপ্রান্তে বসিয়া দেবহুতি একমনে তাহা শ্রবণ করিতেছেন। রাজকন্যা বলিয়া তাঁহার প্রাণে একটুও দাম্ভিকতা ছিল না।

দেবহুতির পর পর নয়টি কন্যা হইয়াছিল। কন্যাদিগের মধ্যে অরুন্ধতী ও অনুসূয়া বিশেষ বিখ্যাতা। ইঁহারা এত দূর সতীসাধ্বী ও পতিব্রতা ছিলেন যে, আমাদের দেশের মেয়েরা বিবাহকালে "অরুন্ধতী" হইবার প্রার্থনা করে। দেবহুতি সাংখ্যদর্শনশাস্ত্রে এতদূর ব্যুৎপন্না ছিলেন যে, তিনি আপন পুত্র কপিলকে সাংখ্যদর্শন শিক্ষা দিয়াছিলেন। কপিলের সাংখ্যদর্শন বাঙ্গালার গৌরব—ভারতের গৌরব। এ স্থলে সাংখ্যদর্শনের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি, তাহা পাঠে পাঠকগণ

বুঝিতে পারিবেন—দেবহুতি অধ্যাত্ম বিদ্যায় কত দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন।

ত্রিতাপের নিবৃত্তি ও পুরুষার্থের বিষয় বিশেষরূপে লিখিত আছে। ইহা ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে বিষয়-নিরূপণ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রকৃতির কার্য্য, তৃতীয় অধ্যায়ে বিষয়-বৈরাগ্য, চতুর্থ অধ্যায়ে বিষয়বিরাগী মুমুক্ষুগণের সম্বন্ধে পিঙ্গলানাম্নী বেশ্যা ও কুবরী নাম্নী পক্ষিণীর আখ্যায়িকা, পঞ্চম অধ্যায়ে পাপক্ষয় বর্ণন এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে উল্লিখিত বিষয়সকলের সামান্য অর্থ কথিত হইয়াছে। প্রকৃতি ও পুরুষের বিচার-জ্ঞানই সাংখ্যশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। ইহা অতি প্রাচীন শাস্ত্র। ভগবান কপিলদেব স্বীয় মাতা দেবহুতিকে এই শাস্ত্রের উপদেশ দেন। এই শাস্ত্রের কোন কোন সূত্রের অসদর্থ করিয়া, কোন কোন পণ্ডিত সাংখ্যশাস্ত্রকার মহর্ষি কপিলদেবকে নিরীশ্বরবাদী বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। কোন কোন পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্রকৃত তত্ত্ব-কৌমুদী গ্রন্থের "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই সূত্র অবলম্বন করিয়া নাস্তিকমত-পোষক কতকগুলি যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু নামক পণ্ডিত বলেন, "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" ইহার অর্থ ঈশ্বর নাই, ইহা কখনই হইতে পারে না। ইহার প্রকৃত অর্থ এই, ঈশ্বর বাক্য ও মনের অগোচর; সুতরাং যুক্তি দ্বারা সম্যক্ প্রকারে ঈশ্বর সিদ্ধ করিতে পারা যায় না। ভগবান কপিলদেবের যদি নাস্তিক মত পরিপোষণের তদ্রূপ বাসনা থাকিত, তবে তিনি ঐ সূত্রের পরিবর্ত্তে "ঈশ্বরাভাবাৎ" অর্থাৎ ঈশ্বরের অভাব এই সূত্রই প্রচার করিতেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ত্রিতাপের নিবৃত্তিই মানবাত্মার মুখ্য উদ্দেশ্য। দুঃখ অর্থাৎ তাপ তিন প্রকার; আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। ঐ আধ্যাত্মিক দুঃখ আবার দুই প্রকার—শারীরিক ও

মানসিক।* বাত, পিত্ত, কফ ও ধাতুর ব্যতিক্রমজনিত জ্বরাতিসার প্রভৃতি রোগের নাম শারীরিক দুঃখ। স্ত্রী, পুত্র, ধনাদি প্রিয় পদার্থের বিয়োগ ও কলঙ্ক-রটনাদি অপ্রিয় ঘটনার নাম মানসিক দুঃখ। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জজনিত চারি প্রকার দুঃখকে আধিভৌতিক দুঃখ কহে ও প্রাকৃতিক কারণে যে দুঃখ হয়, তাহার নাম আধিদৈবিক। মনুষ্যমাত্রেই এই ত্রিবিধ দুঃখে সন্তাপিত। এই ত্রিতাপ হইতে মনুষ্যমাত্রকে মুক্ত করাই সাংখ্যদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সাংখ্যশাস্ত্র বলেন, পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের বিবেকজ্ঞানে এই দুঃখ দূর হয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি; সুতরাং পৃথিবীর গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। উপরোক্ত পঞ্চ মহাভূত হইতেই চতুর্দ্দশ ভুবনের উৎপত্তি। মনুষ্যমাত্রই এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বে গঠিত। মনুষ্যমাত্রই স্থুলদেহবিশিষ্ট ও সূক্ষ্মদেহবিশিষ্ট। সাংখ্য-মতে জড়দেহ হইতে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেই সমস্ত দুঃখের অবসান হয়। আমিত্বজ্ঞানকে একেবারে নষ্ট করিতে পারিলেই জড়দেহ হইতে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারা যায়। পঞ্চবিংশতি তত্ত্বে জ্ঞান জন্মিলে জড় জগতের অনিত্য জ্ঞান জন্মে। এই জ্ঞান হইতেই মুক্তি।*

লোপামুদ্রা

লোপামুদ্রার স্বামীর নাম ছিল অগস্ত্যমুনি। তিনি বিদর্ভ-রাজের কন্যা ছিলেন। রাজকন্যা, সুতরাং রাজপ্রাসাদবাসিনী হইয়াও তিনি কেবল বিদ্যাবত্তা-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া কুটীরবাসী অগস্ত্যমুনিকে স্বামিত্বে বরণ করেন। কথিত আছে, অগস্ত্য ঋষি অত্যন্ত প্রভাবশালী ঋষি ছিলেন। বিন্ধ্যাচল যখন তাহার গগনচুম্বী দেহ বিস্তার করিয়া সূর্য্যদেবের গতিরোধ করিতেছিল, তখন দেবতারা অনন্যোপায় হইয়া অগস্ত্যঋষির শরণাপন্ন হন। অগস্ত্যঋষি বিন্ধ্যাচলের নিকট উপস্থিত হন, বিন্ধ্যাচল ঋষিকে দর্শনমাত্র সসম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন। ঋষি বিন্ধ্যাচলের শির আপন পদতলে নত দেখিয়া তাহাকে বলেন, যতক্ষণ আমি ফিরিয়া না আসি, ততক্ষণ এইভাবেই থাক। বিন্ধ্যাচল ঋষির কথায় সেইভাবে মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। কথিত আছে, অগস্ত্য মুনিও আর তথায় ফিরিয়া আসিলেন না, বিন্ধ্যাচলও আর মাথা তুলিলেন না। যেদিন বিন্ধ্যাচলের নিকট হইতে "পুনঃ আসিব" বলিয়া অগস্ত্য ঋষি যাত্রা করেন, সেদিন মাসের প্রথম দিন। অগস্ত্য ঋষি ঐ দিন যাত্রা করিয়া আর কখনও প্রত্যাগমন করেন না বলিয়া আমাদের হিন্দু ভ্রাতাগণ অদ্যাপি মাসের প্রথম দিন কোথাও যাত্রা করেন না। লোপামুদ্রা ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের কয়েকটি ঋক্ রচনা করিয়াছিলেন।

লোপামুদ্রার চরিত্রে আমরা দুইটি গুণের সমাবেশ দেখিতে পাই। প্রথমতঃ তিনি এক মহাপরাক্রান্ত রাজার কন্যা ছিলেন, ইচ্ছা করিলে তিনি কোনও এক ধনবান্ রাজপুত্রের সহিত বিবাহিতা

হইয়া মহাসুখে রাজপ্রাসাদে থাকিয়া কালাতিপাত করিতে পারিতেন—অযুত দাসদাসী তাঁহার পরিচর্য্যা করিত—বহুমূল্য রত্নরাজিখচিত অলঙ্কার পরিধান করিয়া মহানন্দে সঙ্গীতালোচনায় কাল কাটাইতে পারিতেন। কিন্তু লোপামুদ্রা ছিলেন অন্যরূপ। পৃথিবীর ভোগ-বিলাসে দুর্লভ মানবজীবনকে ভাসাইয়া দিয়া ক্ষণিক—ক্ষণভঙ্গুর সুখ ভোগ করা তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি বিদ্যাচর্চ্চা ও ধর্ম্মচর্চ্চাকেই জীবনের শ্রেয় ও প্রেয় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ভারতের প্রাচীন মহিলাগণের আদর্শই এইরূপ ছিল। ভোগবিলাস অপেক্ষা তাঁহারা পরকাল ও পরজন্মের জন্যই অধিক ভাবিতেন। দুগ্ধফেননিভ শয্যাপেক্ষা ধার্ম্মিক পতির কুটীরে মৃৎশয্যাই তাঁহাদের নিকট অধিকতর রমণীয় বলিয়া বোধ হইত। এই কারণে সে সময়ে স্ত্রীলোক দেখিলে সকলের মস্তক সম্ভ্রমে তাঁহাদের পদতলে লুণ্ঠিত হইত—এই কারণেই তখনকার ত্যাগী মহিলাগণকে দেখিয়া সকলে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত। কিন্তু কালক্রমে সে আদর্শ গিয়াছে, এখন আর সে আদর্শ নাই বলিয়াই রমণী আদর্শরূপিণী না হইয়া ভোগবিলাসের আধার হইয়াছেন।

গার্গী

গার্গী প্রাচীন যুগের বিদূষী রমণীগণের শিরোরত্ন। প্রাচীন কালে তাঁহার ন্যায় বিদূষী রমণী আর কেহ ছিল কি না সন্দেহ। বচক্নু নামক মুনি তাঁহার পিতা। এই পিতার নিকট থাকিয়া গার্গী বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্র এরূপ আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, বড় বড় বেদ উপনিষদজ্ঞ পণ্ডিত পর্য্যন্ত তাহার সহিত বিচারে পরাজয় স্বীকার করিতেন। সে সময়ে বিদূষী নারীগণ প্রকাশ্য সভায় বসিয়া বিদ্বান-গণের সহিত অকপটে শাস্ত্র বিচার করিতেন। অবরোধপ্রথা কাহাকে বলে দেশ তাহা জানিত না। "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রম্যন্তে তত্র দেবতা" ইহাই ছিল তখনকার কথা।

সেই সময়ে বিদেহ রাজ্যের সিংহাসনে জনক নামক রাজা উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি রাজা হইলেও অধ্যাত্ম সম্পদে সম্পদমান ছিলেন— শুকদেবের ন্যায় বড় বড় ঋষি মুনি পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষার জন্য আসিতেন। পদ্মপত্রে জল যেমন টলমল ভাবে থাকে, কখনও পত্রের সহিত জড়াইয়া যায় না, রাজা জনকও রাজোচিত আচার-ব্যবহার ও জাঁকজমক করিলেও তিনি সংসারে কখনও আসক্ত হইতেন না। এইজন্য সকলে তাঁহাকে "রাজর্ষি জনক" বলিত। এই রাজর্ষি জনক মধ্যে মধ্যে দুরূহ শাস্ত্রবিষয়ক আলোচনার জন্য দেশের পণ্ডিত-মণ্ডলীকে আহ্বান করিতেন। তাঁহার রাজপ্রাসাদের অঙ্গনে বিরাট সভার অধিবেশন হইত, সে সভায় শুধু যে মুনিঋষিরাই স্থান গ্রহণ করিতেন, তাহা নহে; বিদূষী নারীগণও স্থান পাইতেন। বিচারে যিনি জয়ী হইতেন তিনি বহু গাভী পারিতোষিক পাইতেন। এক

দিন রাজর্ষি জনক ঐরূপ একটি সভার আহ্বান করেন। সভায় বিচারে যিনি জয়ী হইবেন তাঁহাকে দিবার জন্য এক সহস্র গাভী রাখিয়া দিয়াছিলেন, প্রত্যেক গাভীর শৃঙ্গে দশটি করিয়া স্বর্ণ মুদ্রাও বাঁধিয়া দিয়াছিলেন।

সভায় ঋষি, মুনি, পণ্ডিত, বিদুষী প্রভৃতি সম্মিলিত হইয়া স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলে রাজর্ষি জনক দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনাদের মধ্যে যিনি ব্রহ্মজ্ঞ, তিনি এই সমস্ত গাভী লইয়া যান।" ক্ষণ কালের জন্য সেই বিরাট রাজসভা নীরব, নিস্তব্ধ হইল। পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই উঠিতে সাহস করিলেন না। তখন সুপ্রসিদ্ধ মুনি যাজ্ঞবল্ক্য উঠিয়া গাভীগুলি আপন বাড়ীতে তাড়াইয়া লইবার জন্য আদেশ করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য মহাজ্ঞানী, বিখ্যাত ব্রহ্মবেত্তা; তাঁহাকে দণ্ডায়মান হইতে দেখিয়া কোন পণ্ডিতই কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। তখন মহিলাদের আসন হইতে ধীরে ধীরে গার্গী উঠিয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আপনিই কি এই বিরাট সুধীমণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হাঁ। গার্গী তাঁহার ধৃষ্টতা দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। সেই প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন। সমবেত সুধী-মণ্ডলীর মুখে গার্গীর জয় জয় ধ্বনি উত্থিত হইল। গার্গীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ "ব্রহ্মজ্ঞ" বলিয়া সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে স্বীকৃতা হইলেন। সেই এক সহস্র গাভী গার্গীর বাড়ীতে প্রেরিত হইল।

মণ্ডন-পত্নী ভারতী

শিবাবতার শঙ্করাচার্য্যের সময়কার কথা। "ভগবান এক ভিন্ন দুই নহেন"—এই অদ্বৈত ও বেদান্তবাদের প্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য আপন মত-প্রতিষ্ঠার জন্য শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইতেছিলেন। যে কেহ তাঁহার সহিত তর্কযুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছিল, সেই-ই তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতেছিল। শঙ্করাচার্য্য এইভাবে স্বমত প্রচার করিতে করিতে মণ্ডন মিশ্রের আলয়ে উপস্থিত হন। উভয়ে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উদ্যোগী হন, কিন্তু মধ্যস্থার অভাবে তাঁহাদের বিচার সভা বসিতে পারে না। এমন সময় মণ্ডন-পত্নী উভয়ভারতীর বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইয়া মণ্ডন ও শঙ্করাচার্য্য উভয়েই তাঁহাকে মধ্যস্থা নির্ব্বাচিত করেন। একদিন নয়, দুই দিন নয়, দীর্ঘ অষ্টাদশ দিবস ব্যাপিয়া উভয়ে এই তুমুল তর্ক চলিতে লাগিল, ভারতী মনোযোগসহকারে উভয়ের তর্ক-বিতর্ক শুনিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে শঙ্করকে জয়ী হইতে দেখিয়া সেই জয়মাল্য শঙ্করের গলায় পরাইয়া দিলেন। স্বামীর পরাজয়ে উভয়ভারতী নিরতিশয় ব্যথিতা হইলেও বিচারে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিলেন না। প্রাচীনযুগের মহিলাগণ এমনই বিদুষী, বিচারনিপুণা ও পক্ষপাতশূন্যা ছিলেন।

মণ্ডনকে পরাজয় করিয়া শঙ্কর বিজয়োল্লাসে প্রমত্ত হইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময় ভারতী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর! আমার স্বামীকে পরাভূত করিয়াছ বলিয়াই

মনে করিও না যে, তুমি বিজয়ী হইলে, যদি আমাকে পরাজিত করিতে পার, তবেই তোমাকে বিজয়ী বলিয়া স্বীকার করিব।"

মহিলার গর্ব্বিত বাক্য শুনিয়া শঙ্কর বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং ভারতীর আহ্বান উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তাঁহার সহিত তর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। দিনের পর দিন—সপ্তাহের পর সপ্তাহ—মাসের পর মাস গেল—শঙ্কর ও ভারতী তর্ক করিতে লাগিলেন। শঙ্কর প্রশ্ন করেন, ভারতী তাহার উত্তর প্রদান করেন; আবার ভারতী প্রশ্ন করেন, শঙ্কর তাহার উত্তর দেন। এই ভাবে প্রশ্নোত্তরে কতক দিন গেল। ভারতী কত শাস্ত্র, কত বিষয়ে যে শঙ্করকে প্রশ্ন করিলেন তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী শঙ্কর সে সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়া ভারতীকে অবাক্ করিয়া তুলিতে লাগিলেন। ভারতী যখন কোন শাস্ত্রেই শঙ্করকে পরাজিত করিতে পারিলেন না, তখন তিনি রতিশাস্ত্রের প্রসঙ্গ তুলিলেন। শঙ্কর আবাল্য সংসারত্যাগী। রতি-শাস্ত্র কাহাকে বলে, স্ত্রীলোকই বা কিরূপ, ইন্দ্রিয়-লালসাই বা কাহাকে বলে ইত্যাদি বিষয়ে তিনি কিছুই জানিতেন না। কাজেই ভারতীর প্রশ্নে এবার তিনি যৎপরোনাস্তি চিন্তান্বিত হইলেন। শেষে অন্য উপায় না দেখিয়া ভারতীর নিকট হইতে কিছু দিনের সময় লইয়া তিনি অন্য এক রাজ্যে গিয়া এক মৃত রাজার শরীরে প্রবেশ করেন এবং সজীব রাজা রূপে শত শত যুবতী নারীর সহিত সঙ্গীত, বাদ্য ও সম্ভোগাদিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া পুনরায় ভারতীর নিকট প্রত্যাগমন করেন। এবার ভারতী তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। অতঃপর মণ্ডন ও ভারতী—স্বামী স্ত্রী উভয়েই শঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শঙ্করের শেষ জীবন পর্য্যন্ত ভারতী তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া শঙ্কর-মত প্রচার করিয়াছিলেন।

গোপা

প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার কথা, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য বুদ্ধদেব আবির্ভূত হন। তাঁহার বাল্য নাম ছিল—সিদ্ধার্থ। তাঁহার পিতা শুদ্ধোধন কপিলাবস্তু রাজ্যের রাজা ছিলেন, পুত্রের মন যাহাতে সন্ন্যাসের দিকে না যায়, শুদ্ধোধন সেজন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। সিদ্ধার্থের বয়স যখন ১৯ বৎসর তখন কলিদেশের রাজা দণ্ডপাণির কন্যা গোপার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

দশবৎসর কাল সিদ্ধার্থ গোপার সহিত বিশেষ আনন্দিতমনে সংসার করিয়াছিলেন। গোপা স্বাধীনভাবে স্বচ্ছন্দে অন্তঃপুরে বেড়াইতেন, সকলের সহিত আলাপ-পরিচয় করিতেন, ইহা দেখিয়া রাজ-অন্তঃপুরের অনেকে গোপার নিন্দাবাদ করিত। গোপা তাঁহাদিগকে বলিতেন, "তোমরা এইভাবে আমার নিন্দাবাদ কর কেন? স্ত্রীলোকের মনে যদি ধর্ম্মের বল থাকে, তাহা হইলে তাহার অবগুণ্ঠনের প্রয়োজন হয় না; আর যদি অবগুণ্ঠন পরিয়াও স্ত্রীলোকের ধর্ম্মভয় না থাকে, তাহা হইলে কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না।"

বলা বাহুল্য, গোপা এই কথা বলিবার পর পুরনারীরা আর কখনও গোপাকে অবগুণ্ঠন পরিতে বলিত না।

স্বামী সিদ্ধার্থের সহিত সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করিবার পর দশবৎসর পরে গোপার একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। ছয় দিনের শিশু লইয়া গোপা যখন সূতিকাগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন বিশ্ববাসীর মোক্ষের জন্য সিদ্ধার্থ গৃহ ত্যাগ করেন। যেদিন হইতে স্বামী রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইলেন, গোপাও সেইদিন হইতে রাজ-

পুত্রবধূর বেশ ত্যাগ করিয়া দীনাহীনা সন্ন্যাসিনী-বেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। গোপার শ্বশুর-শাশুড়ী কত বুঝাইলেন, গোপা কিছুতেই ভোগ-বিলাসে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "আমার স্বামী যে পথে গিয়াছে, সেই পথই আমার পক্ষে প্রশস্ত পথ।" পুত্র-বধূর এই কথা শুনিয়া সিদ্ধার্থের বিমাতা গৌতমী দেবী নীরব হইলেন। সিদ্ধার্থের জননী মহামায়া সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণ করিবার ৭ দিন পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ছয় বৎসর কঠোর সাধনা করিয়া সিদ্ধার্থ সিদ্ধি লাভ করিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করেন, নানা স্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে করিতে অবশেষে তিনি একবার কপিলাবস্তুতে আসেন। বৃদ্ধ পিতা শুদ্ধোধন তখনও জীবিত। রাজপুরীতে বুদ্ধের আগমনসংবাদ পৌঁছিলে সকলেই তাঁহাকে দেখিতে ছুটিল। ছাদের উপর উঠিয়া গোপা স্বামীর মুণ্ডিত কেশ ও দীন ভিখারীর বেশ দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। পরক্ষণেই ভাবিলেন, না, না, আমার স্বামী যে পথে গিয়াছেন তার চেয়ে আর সুন্দর পথ ইহ-সংসারে নাই। আমি কোন মতে ইঁহার সন্ন্যাস পথের কণ্টক হইব না। অতঃপর রাজা শুদ্ধোধনের আমন্ত্রণে বুদ্ধদেব রাজবাড়ীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। অন্যান্য পুরনারীরা সিদ্ধার্থের নিকট আসিলেন বটে, কিন্তু গোপা তাঁহাকে দেখা দিলেন না। গোপা ভাবিলেন, আমি স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে হয়ত আমার স্বামীর সাধনার পথে বাধা পড়িবে। এই ভাবিয়া তিনি শুধু আপন পুত্র রাহুলকে বুদ্ধের নিকট প্রেরণ করেন।

রাহুল বুদ্ধের নিকট "পিতৃধন" প্রার্থনা করিলে বুদ্ধ তাঁহাকে সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন।

ইহার পর আরও কতদিন পরে—রাজা শুদ্ধোদনের মৃত্যুকালে

বুদ্ধদেব আর একবার কপিলাবস্তুতে আসিয়াছিলেন, তাঁহার সমক্ষে রাজা শুদ্ধোদনের মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর গোপা ও অন্যান্য পুরস্ত্রীরা বুদ্ধদেবের নিকট সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বুদ্ধ তাঁহাদের লইয়া একটি "ভিক্ষুণী" সম্প্রদায় গঠন করেন। গোপা সেই সম্প্রদায়ের কর্ত্রী বা পরিচালিকা হইয়াছিলেন।

খুল্লনা

সহস্রাধিক বর্ষের পূর্ব্ব কথা। গৌড় তখন একটি সমৃদ্ধিশালী হিন্দুরাজ্য ছিল। তাঁহাদের রাজধানীতে সকল জাতীয় লোকই বাস করিত। বাণিজ্য-ব্যবসায় করিয়া রাজ্যের অনেক বণিকই বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। তখন আধুনিক বর্দ্ধমান জেলার মঙ্গল-কোটের অনতিদূরবর্ত্তী উজানী নগরে বিক্রমকেশরী নামে এক সামন্ত রাজা বাস করিতেন। ধনপতি দত্ত নামে তাঁহার একজন রাজবণিক ছিলেন এবং উজানীর অনতিদূরবর্ত্তী ইছানী গ্রামে লক্ষপতি সদাগর বাস করিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নাম রম্ভাবতী। রম্ভাবতীর গর্ভে রত্নমালা নাম্নী কন্যার জন্ম হয়। রত্নমালার অসামান্য রূপ-সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া লোকে তাঁহার নাম রাখেন—"খুল্লনা।" খুল্লনার বয়স যখন একাদশ বৎসর, তখন ধনপতি দত্তের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ধনপতি জাতিতে গন্ধবণিক ছিলেন। ধনপতির লহনা নামে পূর্ব্ব-পক্ষের এক পত্নীও ছিল। লহনা স্বামীর দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রাচীনা দাসী দুর্ব্বলাকে বলিলেন—

---

* কবিকঙ্কণ চণ্ডীর "খুল্লনা" অবলম্বনে লিখিত।

শোকানলে পোড়ে মন, দাবানলে যেন বন
আঁখিজল নিবারিতে নারি।
এ শোক রহিল মনে, স্বামী দিব আনজনে
সঞ্চয় করিয়া ঘর গারী।
বহু ব্যয় করি কড়ি, করিলাম খাট পিঁড়ি
সগল্লাদ নিহালী পামরী।
চন্দন কুসুম গুয়া, কুঙ্কুম কস্তুরী চূয়া,
কারে দিব মন্দির মশারি।

ধনপতি খুল্লনাকে বিবাহ করিয়া তাহাকে ঘরে লইয়া আসিলেন। নানা প্রকার সোণার চুড়ী ও পাটের শাড়ী পাইয়া লহনা আপাততঃ সপত্নী-বিদ্বেষ এবং স্বামীর উপর ক্রোধ বিস্মৃত হইল। তবে স্বামীকে আপন পক্ষে বশ করিবার জন্য বশীকরণের অনেক প্রক্রিয়া করিতে ছাড়িল না।

ধনপতি রাজবণিক ছিলেন। বিবাহের কয়েকদিন পরে রাজা বিক্রম-কেশরী ধনপতিকে আহ্বান করিয়া একটি স্বর্ণপিঞ্জর তৈয়ারী করিবার জন্য গৌড় দেশে যাইবার আদেশ করিলেন। ধনপতি লহনার উপর বালিকা খুল্লনার ভার ন্যস্ত করিয়া চিন্তান্বিতমনে গৌড় দেশে যাত্রা করিলেন। লহনা স্বামীর আজ্ঞানুসারে খুল্লনাকে আপন কনিষ্ঠ ভগ্নীর ন্যায় সমাদর করিতে লাগিলেন। খুল্লনাকে খাওয়াইয়া তবে তিনি নিজে খাইতেন। সপত্নীর প্রতি এতাদৃশ স্নেহ, যত্ন ও ভালবাসা দাসী দুর্ব্বলার প্রাণে কিন্তু গরল বর্ষণ করিত। দুর্ব্বলা মনে ভাবিল, এই দুই সপত্নীতে যদি মিলামিশা থাকে, তাহা হইলে দুইজনের হুকুম পালন করিতে তাহার প্রাণান্ত হইবে, তদপেক্ষা কোন উপায়ে যদি উভয়ের মধ্যে একটা বিচ্ছেদ জন্মান যায়, তাহা হইলে আর খুল্লনার পরিচর্য্যা তাহাকে করিতে হইবে না। এই ভাবিয়া সে একদিন

লহনাকে বলিল, "দেখ তুমি দুধ কলা দিয়া ঐ কাল-সাপিনীকে পুষিতেছ কেন? তুমি প্রৌঢ়া, আর ঐ খুল্লনা যুবতী, তুমি কি মনে কর তোমার স্বামী খুল্লনা অপেক্ষা তোমাকে অধিক ভালবাসিবে? অতএব এখন হইতে এমন সমস্ত উপায় উদ্ভাবন করিতে থাক, যাহাতে খুল্লনাকে তাহার স্বামী কখনও দু'চোখ পাড়িয়া দেখিতে না পারে।" দুর্ব্বলার কথাগুলি লহনার প্রাণের অন্তস্তলে এরূপভাবে বিদ্ধ হইল যে, লহনা দুর্ব্বলার অভিপ্রায়ানুসারে চলিতে রাজি হইল। দুর্ব্বলার ষড়যন্ত্রে লহনা একখানি জাল চিঠি লেখাইয়া তাহা খুল্লনাকে পড়িয়া শুনাইল। সেই চিঠিতে যেন ধনপতি লহনাকে লিখিতেছেন,—"এখানে পিঞ্জর প্রস্তুত করিবার জন্য যে স্বর্ণ আনা হইয়াছিল তাহা ফুরাইয়া গিয়াছে। আরও কিছু স্বর্ণের প্রয়োজন। অতএব খুল্লনার যে সমস্ত স্বর্ণালঙ্কার আছে তাহার নিকট হইতে সেই সমস্ত লইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিবে। খুল্লনাকে ছাগরক্ষায় নিযুক্ত করিবে, সে যেন উদর পূরিয়া ভোজন করিতে না পায়, তাহাকে ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিতে দিবে, ঢেঁকিশালায় শয়ন করাইবে, রোগ হইলে তাহাকে ঔষধ-পথ্য দিবে না, তাহার মস্তকের কেশ মুণ্ডন করিয়া দিবে, পান স্থপারি তাহাকে খাইতে দিবে না, ব্যঞ্জনে ঘৃত লবণ দিবে না, সে যেন কুঙ্কুম কস্তুরী চূয়া চন্দনাদি কোনও বিলাসদ্রব্য ব্যবহার করিতে না পারে, যে প্রকারে হউক, তাহার যৌবনের শ্রী নষ্ট করিয়া দিবে।"

খুল্লনা কোন মতেই বিশ্বাস করিতে চাহিল না যে, সেই চিঠি তাহার স্বামীর লিখিত। তখন দুর্ব্বলা বলিল, "দেখ তোমার স্বামীর বহু ভৃত্য-কর্ম্মচারী ও পরিচারক-পরিচারিকা আছে, বোধ হয়, তাহাদের মধ্যে কেহ তাঁহার আদেশে লিখিয়াছেন। তুমি কি সীতাদেবীর উপাখ্যান শুন নাই? সীতাদেবী স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য আগুনে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছিলেন। তুমি কয়েকদিন স্বামীর আজ্ঞামত চল, দেখিবে,

স্বামী তোমার উপর মহাসন্তুষ্ট হইবেন। তুমি যদি দিন কতক ছাগল চরাইতে আরম্ভ কর, তাহা হইলে সে সংবাদ শুনিয়া তোমার পিত্রালয় হইতে লোক আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইবে, তখন তোমার স্বামী তোমাকে তোষামদ করিতেও পথ পাইবে না।"

খুল্লনা আর কি করেন? তিনি দুর্ব্বলাকে বলিলেন, "তুমি ইছানীতে গিয়া আমার পিতামাতার নিকট আমার দুঃখ-কাহিনী গিয়া বর্ণনা কর।" দুর্ব্বলা তাহাই করিল। কিন্তু টীকা-টিপ্পনী দিয়া খুল্লনার মাতা-পিতাকে বলিল, "তোমাদের কন্যা খুল্লনা এখন ছাগল চরাইতেছে, যদি তাহাকে সে কার্য্য হইতে ফিরাইয়া আন, তাহা হইলে জামাতা গৌড় হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার উপর এরূপ অসন্তুষ্ট হইবে যে, কন্যাটির ভাবীজীবন অত্যন্ত দুঃখকর হইবে।" জামাতার বিরাগ-ভয়ে রম্ভাবতী আর কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না।

এদিকে দুর্ব্বলা ইছানীনগর হইতে ফিরিয়া আসিয়া উদ্বিগ্নমনা খুল্লনাকে কহিল যে, তোমার পিতামাতা তোমার দুঃখ-দুর্দ্দশার কাহিনী শুনিয়া ভাল-মন্দ কিছুই বলিলেন না। কবিকঙ্কণের কথায়—

"কহিলা দুর্ব্বলা তারে সব বিবরণ।
গিয়াছিলাম তোমার বাপের নিকেতন॥
একত্র আছিলা বসি তোমার পিতামাতা।
তাহা সবাকার স্থলে কহিনু সব কথা॥
শুনি ভাল মন্দ না বলিল লক্ষপতি।
মৌন করি রহিল জননী রম্ভাবতী॥
দেখিনু তোমার পিতা বড়ই কৃপণ,
দিলেন তোমার তরে কড়ি চারিপণ॥
এমন শুনিয়া রামা ছাড়য়ে নিঃশ্বাস।
পাতালে প্রবেশি যদি পাই অবকাশ॥

দুর্ব্বলা বিনাইয়া বিনাইয়া নিজের পিতা মাতা সম্বন্ধে খুল্লনার মনে এরূপ বিরাগ জন্মাইয়া দিল যে, সে আর তাহার পিতামাতার নাম ভ্রমক্রমেও করিত না। খুল্লনা প্রতিদিন সকালে ছাগ লইয়া চরাইতে বাহির হইত এবং সন্ধ্যাকালে ছাগ চরাইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলে লহনা সেগুলিকে গণিয়া ঘরে লইত। অতঃপর কচুর পাতায় করিয়া কদন্ন খুল্লনাকে খাইতে দিত। তার পর কোন দিন ঢেঁকিশালায়, কোন দিন বা ছাগশালায় খুল্লনা শয়ন করিত।

একদিন ছাগ চরাইতে গিয়া প্রখররৌদ্রতাপে ক্লান্ত হইয়া খুল্লনা এক বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া আছে, এমন সময় কে বা কাহারা তাহার "সর্ব্বশী" নাম্নী ছাগীটিকে চুরি করিয়া লইয়া গেল। খুল্লনা জাগরিত হইয়া বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্ব্বতে সর্ব্বশীর অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সন্ধ্যাকালে ঘরে ফিরিলে সর্ব্বশীকে দেখিতে না পাইলে লহনা তাঁহাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবে, এই চিন্তায় খুল্লনার সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। খুল্লনা সেদিন আর ঘরে ফিরিল না। এদিকে খুল্লনাকে এক রাত্রি ঘরে ফিরিতে না দেখিয়া লহনার মহাচিন্তা উপস্থিত হইল। তাই ত খুল্লনা গেল কোথায় ? বাঘে ভাল্লুকে কি তাহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে ? অথবা অভিমানে কি খুল্লনা আত্মহত্যা করিয়াছে ? ইত্যাকার নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে লহনা খুল্লনার অনুসন্ধানে বাহির হইল। সুখের বিষয়, পথি-মধ্যেই খুল্লনার সহিত সাক্ষাৎ হইল। লহনা খুল্লনাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং আর কখনও তাহার উপর অত্যাচার করিবে না, একথাও বলিল। বাড়ীতে লইয়া গিয়া লহনা হরিদ্রা কুঙ্কুম দ্বারা খুল্লনার সর্ব্বাঙ্গ লেপন করিয়া দিল। সেই দিন হইতে খুল্লনার কষ্টের লাঘব হইল এবং লহনা তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় সমাদর করিতে লাগিল।

এদিকে ধনপতি স্বর্ণপিঞ্জর লইয়া রাজাকে তাহা দিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এবার দুর্ব্বলা খুল্লনার নিকট গিয়া ধনপতির আগমনের সংবাদ দিল, এক বৎসর পরে স্বামী ঘরে আসিতেছেন শুনিয়া খুল্লনা তাহাকে একটি মাণিকের অঙ্গুরীয় উপহার দিলেন। পক্ষান্তরে দুর্ব্বলা লহনার নিকট গিয়াও তাঁহাকে ঐরূপ সংবাদ দিয়া কিছু পুরস্কার লাভ করিল। এদিকে ধনপতি গৃহে প্রবেশ করিয়া লহনা ও খুল্লনা উভয়কেই আলিঙ্গন করিলেন। লহনা এমন ভাবে বিনাইয়া বিনাইয়া ধনপতিকে সমস্ত কথা বলিতে লাগিলেন যে, যেন তাঁহার অবর্ত্তমানে খুল্লনার কোনই কষ্ট হয় নাই। লহনা রাঁধিয়াছেন আর খুল্লনা তাহা খাইয়া হৃষ্টচিত্তে সখীদের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করিয়া বেড়াইয়াছেন।

ধনপতি সেদিন খুল্লনার হাতে খাইতে চাহিলেন। অনেক বন্ধু-বান্ধবকেও তিনি নিমন্ত্রণ করিলেন। খুল্লনা অতি যত্নের সহিত রন্ধন করিলেন। বন্ধু-বান্ধবেরা খুল্লনার রন্ধনের তারিফ করিতে লাগিল। অতঃপর রাত্রিকালে খুল্লনা লহনার পদধূলি গ্রহণ করিয়া স্বামী-সকাশে গমন করিলেন। কিন্তু হায়! হায়! যাইয়া দেখে—স্বামীর বাক্-শক্তিহীন নিঃস্পন্দ দেহ খট্টাঙ্গের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। খুল্লনা স্বামীর পদযুগল ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া যখন কোন মতেই স্বামীর দেহে প্রাণের সঞ্চার করিতে পারিলেন না, তখন বিষ পান করিয়া প্রাণবিসর্জ্জন করিতে উদ্যোগী হইলেন। তাঁহার প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তাঁহার স্বামী জীবিত হইয়া উঠিলেন। সদাগর খুল্লনাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলে খুল্লনা একে একে এক বৎসরের সমস্ত কথা কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার নিকট বলিতে লাগিলেন।

"তুমি হেন মোর স্বামী, ছাগল রাখিনু আমি
এই লাভে পুরাবে ভাণ্ডার।

উথলে আমার বাণী, শ্রাবণের যেন পাণি
সমুদ্রের যেমন তরঙ্গ।" ইত্যাদি

খুল্লনার মুখে লহনার ব্যবহারের কথা শুনিয়া এবং লহনার সেই কৃত্রিম চিঠিখানি পাঠ করিয়া সদাগর লহনাকে তৎপর দিবস যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। লহনা সদাগরের উপর অভিমান করিয়া বসিলেন। সদাগর লহনাকে নানাপ্রকার মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতে ছাড়িলেন না। এই সময়ে খুল্লনা পুষ্পবতী হইল, এতদুপলক্ষে সদাগর যথেষ্ট টাকা-কড়ি ব্যয় করিলেন।

এদিকে এক বৎসরকাল ধনপতি সদাগর স্বগৃহ হইতে অনুপস্থিত থাকায় পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ করিতে পারেন নাই। এখন সেই শ্রাদ্ধের উদ্যোগ-আয়োজন হইল। দেশ-বিদেশের বণিকরা আসিয়া শ্রাদ্ধ-দিবসে ধনপতির বাটীতে উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু খুল্লনা একাকিনী বনে বনে ছাগান্বেষণে বেড়াইতেন বলিয়া কেহই ধনপতির বাটীতে অন্নগ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। সকলেই বলিলেন, যদি খুল্লনা সর্ব্বজনসমক্ষে আপন সতীত্ব প্রমাণ করিতে পারেন, তবেই ধনপতির বাটীতে অন্ন গ্রহণ করা হইবে। খুল্লনা একথা শুনিয়া একটুও ব্যথিতা কিংবা ভীতা হইলেন না। তখন মালবৈদ্যের দ্বারা দুইটি বিষধর সর্প আনয়ন করা হইল, তাহাদিগকে কলসী মধ্যে পূরিয়া তাহাতে একটি অঙ্গুরী নিক্ষেপ করা হইল। খুল্লনা সেই অঙ্গুরীয় তুলিয়া লইলেন। কিন্তু পরীক্ষার্থী বণিকগণের ইহাতেও তৃপ্তি হইল না। তাহারা কর্ম্মকারকে ডাকিয়া একটি উত্তপ্ত শাবল হস্তে ধারণ করিলেন, তাঁহার হস্তে একটুও আগুনের আঁচ লাগিল না। অতঃপর বণিকগণ তাঁহাকে জতুগৃহ মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দগ্ধ করিবার প্রস্তাব করিলেব। খুল্লনাকে জতুগৃহে (গালায় নির্ম্মিত) আবদ্ধ করিয়া তাহা জ্বালাইয়া দেওয়া হইল। দাউ দাউ করিয়া অগ্নিশিখা জ্বলিয়া আবার তাহা ম্লান হইয়া আসিল,

অগ্নি নিবিয়া গেল, সকলে দেখিয়া অবাক্ হইল—প্রফুল্ল-আননা খুল্লনা তন্মধ্যে উপবিষ্টা। এবার আর খুল্লনার সতীত্ববিষয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল না। খুল্লনা স্বহস্তে রন্ধন করিলেন এবং সকলে মহাতৃপ্তির সহিত তাহা ভক্ষণ করিলেন।

ইহার কয়েক দিন পরে বিদেশে বাণিজ্য করিবার জন্য সদাগরকে রাজাদেশে সিংহলে যাইতে হইল। স্বামীর বিদেশযাত্রার দিন খুল্লনা শুভঙ্করী দেবীর পূজা ও স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন। এদিকে শিব-ভক্ত ধনপতি সদাগরকে খুল্লনার পূজাগৃহে লইয়া লহনা তাঁহাকে বুঝাইল যে, খুল্লনা ডাকিনীর পূজা করিতেছে। ধনপতি পদাঘাতে পূজার ঘট ফেলিয়া দিলেন এবং খুল্লনার কেশাকর্ষণ করিয়া তাঁহার যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা করিলেন। খুল্লনা স্বামীকে অনেক বুঝাইয়া দেবী-লাঞ্ছনা হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন, কিন্তু সদাগর তাঁহার কোন কথা না শুনিয়া এবং দেবীকে উল্লঙ্ঘন করিয়া অর্ণবপোতে উঠিলেন। দেবীর ক্রোধে মগরা নামক স্থানে সদাগরের সাতখানি তরীর মধ্যে ছয়খানি ডুবিয়া গেল। সেই একখানি জাহাজে আরোহণ করিয়া সদাগর সিংহলের কালীদহ নামক দহে উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন, দহস্থ কমল বনের মধ্যে এক অসামান্য রূপলাবণ্যবতী রমণী। তিনি সিংহলের রাজাকে ইহা দেখাইবার নিমিত্ত রাজঘাটে গিয়া নৌকা বাঁধিলেন। রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া তিনি রাজার নিকট কমলবনে কামিনীর কথা বর্ণনা করিলেন। রাজা ধনপতিকে বলিলেন, "যদি তোমার কথা সত্য হয়, তাহা হইলে তোমাকে অর্দ্ধেক রাজ্য দান করিব।" রাজা অমাত্যগণ-সমভিব্যাহারে কালীদহে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন রাজা সদাগরের মধুকরী জাহাজ ও যাহা কিছু বাণিজ্যসম্ভার বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলেন।

এদিকে উজানীতে খুল্লনার গর্ভে একটি পুত্র প্রসূত হইল। সকলেই

পুত্রটির নাম রাখিলেন—শ্রীমন্ত। শ্রীমন্ত অল্পদিনেই কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি নানাশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠিল। একদিন জনার্দ্দন ওঝা নামক এক তার্কিক বণিকপুত্র শ্রীমন্তের সহিত তর্কে পরাজিত হইয়া তাঁহাকে "জারজ" বলিয়া অভিহিত করিলেন। ক্রোধে, অভিমানে শ্রীমন্ত পিতৃদর্শনে যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। শ্রীমন্ত মাতার পদধূলি লইয়া সিংহলে যাইলেন, আর যতদিন শ্রীমন্ত প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়াছিলেন, ততদিন খুল্লনা কেবল দেবী ভগবতীর পূজা করিয়াছিলেন।

কালীদহে উপস্থিত হইয়া শ্রীমন্তও কমলে কামিনী দর্শন করিলেন। রাজা শ্রীমন্ততে বলিলেন, "যদি কমলে কামিনী দর্শন করাইতে না পার, তবে দক্ষিণ মশানে তোমার শিরচ্ছেদ করা হইবে।" শ্রীমন্ত রাজাকে লইয়া কালীদহে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু কমলে কামিনী দেখাইতে পারিলেন না। তখন শ্রীমন্তকে বলি দিবার জন্য মশানে লইয়া যাওয়া হইল। দেবী নিজে আসিয়া ব্রাহ্মণীরূপে শ্রীমন্তকে কোলে করিয়া বসিলেন। কোটালের সহিত ব্রাহ্মণীর যুদ্ধ বাধিল। ভূত, প্রেত, দানাগণ আসিয়া ব্রাহ্মণীর পক্ষে যুদ্ধ করিতে লাগিল। রাজা স্বয়ং যুদ্ধে আসিলেন, কিন্তু দেবীর হস্তে পরাজিত হইলেন। রাজা শালবান দেবীর পাদপদ্ম ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, দেবী ক্ষমা করিলেন। অতঃপর দেবীর ইচ্ছাক্রমে রাজা শালবানের কন্যার সহিত শ্রীমন্তের বিবাহ হইল ধনপতি সদাগর মুক্তি পাইলেন, রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত তাঁহার দ্রব্যাদিও তিনি ফিরিয়া পাইলেন। পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া প্রত্যাগমনকালে মগরায় নিমজ্জিত পোত ছয়খানিকেও ভাসমান অবস্থায় পাইলেন। সকলে মহানন্দে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর বাঙ্গালার রাজাকে শ্রীমন্ত ভ্রমরার দহে কমলে কামিনী দর্শন করাইলে রাজা কেশরী শ্রীমন্তকে আপন কন্যা সম্প্রদান করিলেন। অতঃপর স্বামী পুত্র ও পুত্রবধূকে রাখিয়া খুল্লনা স্বর্গারোহণ করিলেন।

জেবুন্নেষা

ভারতীয় হিন্দুরমণীগণের ন্যায় মুসলমান রমণীগণও যে বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা ও বীরত্বে কম ছিলেন, এমন নহে। ভারতের ন্যায় বিরাট সাম্রাজ্যও মুসলমান নারীর অঙ্গুলি-হেলনে পরিচালিত হইয়াছে ভারতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। আবার মহারাষ্ট্র-বীরের বীরত্ব-দর্শনে মুগ্ধা মুসলমান মহিলা অকপটে পিতৃহুঙ্কার অগ্রাহ্য করিয়া বীরের চরণে শ্রদ্ধা-ভক্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন, এ দৃষ্টান্তও আমরা জেবুন্নেষার চরিত্র আলোচনা করিলে জানিতে পারি। কেমন করিয়া জেবুন্নেষা বীরত্বের সম্মান করিয়াছিলেন, তাহাই সবিস্তারে বলিতেছি।

দিল্লীর সিংহাসনে ভারতের হিন্দুশক্তিকে উপহাস করিয়া যখন সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব সমাসীন, সেই সময় মহারাষ্ট্রে শিবাজী অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। মোগল শত্রুর সহিত অনেক সঙ্কটাপন্ন যুদ্ধ করিবার পর শিবাজী অবশেষে মোগলের সহিত সন্ধি করেন। সন্ধির সর্ত্তানুসারে শিবাজী মোগলের নিকট হইতে যে যে দুর্গ জয় করিয়াছিলেন তাহা তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিলেন, কেবলমাত্র ঔরঙ্গজেবের অধীনে জায়গীরদার-স্বরূপ দ্বাদশটি দুর্গ তাঁহার অধীন রহিল। অতঃপর রাজা জয়সিংহের অনুরোধে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য শিবাজী দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। সে ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ঐ সনের বসন্তকালে মাত্র পঞ্চশত অশ্বারোহী ও এক সহস্র পদাতিক সৈন্য লইয়া শিবাজী দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেব দরবারে শিবাজীকে পঞ্চ সহস্র সেনার সেনাপতিদিগের মধ্যে বসিতে আদেশ করিয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি অবমাননা করিলেন। দরবারে

ঔরঙ্গজেবের কন্যা জেবুন্নেসা এই মহারাষ্ট্র বীরের অবমাননা স্বচক্ষে দেখিতেছিলেন। এতদিন তিনি বীরকেশরী শিবাজীর বীরত্ব-কাহিনী লোকমুখে শুনিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু আজ তাঁহার তেজোদ্দীপ্ত মুখমণ্ডল, বীরত্বব্যঞ্জক অবয়ব ও স্বাধীনতা-দ্যোতক অঙ্গসৌষ্ঠব-দর্শনে তিনি এতদূর ব্যথিত হইয়াছিলেন যে, দরবার অন্তে সাশ্রুনয়নে স্পষ্টতঃ পিতাকে বলিয়াছিলেন "বীরপ্রবর শিবাজীকে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে এইভাবে দরবার-মধ্যে অবমাননা করা নিতান্ত হীনতার কার্য্য হইয়াছে। এরূপ কার্য্য কখনও সম্রাটের উপযুক্ত নহে।" কন্যা জেবুন্নেষা ঔরঙ্গজেবের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন, গুরুতর রাজকার্য্যে তিনি জেবুন্নেষার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। একবার জেবুন্নেষার কবিতা-পাঠে প্রীত হইয়া তিনি তাঁহাকে ত্রিংশৎ সহস্র সুবর্ণমুদ্রাও পারিতোষিক দিয়াছিলেন। এ হেন প্রাণাধিকা জেবুন্নেষার কথায়ও ঔরঙ্গজেব কর্ণপাত না করিয়া শিবাজীকে শুধু অবমাননা নহে—পরন্তু অবরুদ্ধও করিয়াছিলেন।

এই ঘটনায় আমরা দেখিতে পাই, কাফের হউক, বিধর্ম্মী অথবা বিদ্রোহী হউক, ভারতীয় মুসলমান নারীদের মধ্যেও বীরত্বের সম্মান করিতে অনেকে জানিতেন।

হামির-মাতা

সে আজ অনেক দিনের কথা—চিতোরের রাণা লক্ষ্মণ সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র অমর সিংহ একদিন মৃগয়া করিবার নিমিত্ত অনুচরগণসহ আন্দাবা নামক এক বনে যান। তথায় একটি বৃহদাকার বরাহ দেখিতে পাইয়া রাজকুমার তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করেন। সেই দুর্দ্দান্ত বন্যপশু প্রাণভয়ে ভীত হইয়া নিকটবর্ত্তী একটি শস্যক্ষেত্রে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। একটি যুবতী একটি উচ্চ মাচার উপর বসিয়া শস্যক্ষেত্রে পাহারা দিতেছিল। সে রাজপুত্র ও তাঁহার অনুচরগণকে শস্যক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কহিল, "রাজপুত্র! আপনি সদলবলে শস্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে সমস্ত শস্য আপনার অনুচরগণের পদতলে নিষ্পেষিত হইবে, আপনি দয়া করিয়া শস্যক্ষেত্রের বাহিরে দাঁড়ান, অনুচরগণের প্রতিও উক্ত রূপ আদেশ করুন। আমি বরাহটি মারিয়া দিতেছি।" সেই শস্যক্ষেত্রে ছয় সাত হাত লম্বা জনার গাছ জন্মিয়া ছিল, সেই যুবতী একটি জনার গাছ উপড়াইয়া তাহার অগ্রভাগটা সরু করিয়া ভল্লের মত করিয়া লইল এবং সেই ভল্লের এক আঘাতে দুর্দ্দান্ত বরাহটিকে তৎক্ষণাৎ নিপাতিত করিল। রাজপুত্র ও সৈন্যসামন্ত সকলে কৃষকবালার অসমসাহসিকতা-দর্শনে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল।

কৃষক-যুবতীকে প্রশংসা করিতে করিতে রাজপুত্র ও অনুচরগণ শিবিরে ফিরিলেন। তাঁহারা শিবিরে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় একখানি প্রস্তর আসিয়া রাজপুত্রের অশ্বটির পায়ে লাগিল, অশ্বটি অত্যন্ত বলবান্ হইলেও সেই প্রস্তরের আঘাতে ছট্‌ফট্ করিতে

করিতে মারা গেল। কৃষক-যুবতী তৎক্ষণাৎ শিবির-দ্বারে উপস্থিত হইয়া রাজপুত্রকে বলিলেন, "দেখুন আমি পক্ষী তাড়াইবার জন্য তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ঢিল ছুঁড়িয়াছিলাম, ঢিলটি অকস্মাৎ আপনার ঘোড়ার পায়ে লাগিয়াছে, আমার এই অপরাধের জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

রাজপুত্র বলিলেন, "ইহাতে আর তোমার অপরাধ কি? তুমি ত আর দেখিয়া শুনিয়া ঢিল ছুঁড় নাই। আমি শুধু ভাবিতেছি, যদি তোমার মত আর দশটি শক্তিশালিনী স্ত্রীলোক চিতোরে থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় সেই দশজনের বলেই চিতোর আপন স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিত।"

কৃষক-কুমারী রাজপুত্রকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু রাজপুত্র কৃষকবালার বীরত্ব-কাহিনী ভুলিতে পারিলেন না। তিনি নিজে বীর, কাজেই বীরকন্যার বীরত্ব তাঁহাকে মুগ্ধ করিল। তিনি অনুসন্ধানে জানিলেন, কৃষককন্যা একজন ক্ষত্রিয়ের কন্যা। তিনি নিজেও ক্ষত্রিয়। রাজকুমার ভাবিলেন, এই ক্ষত্রিয়-কন্যা কৃষক-কুমারী হউক, তথাচ ইহাকে বিবাহ করিয়া বীরপত্নী করিব। কৃষক ও কৃষক পত্নী উভয়েই সানন্দে রাজপুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন। যথাকালে কৃষক-বালার গর্ভের অমর সিংহের হামির নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বীর্য্যবতী মাতার পুত্র যে বীর্য্যবান্ হয়, একথার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ হামির। হামির নিজে এত বীর্য্যবান্ ও শক্তিশালী হইয়াছিলেন যে, তিনি চিতোর উদ্ধার করিয়া চিতোরে পুনরায় রাণা বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

ধাত্রী পান্না

মিবারাধিপতি সংগ্রাম সিংহের পুত্র রাণারত্ন অকালে পরলোক গমন করিলে তাঁহার ভ্রাতা বিক্রমজিৎ সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিক্রমজিৎ নিতান্ত উদ্ধত, ক্ষমাবিহীন ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ ছিলেন এবং সতত মল্লদিগের সহিত কালাতিপাত করিতেন। ক্রমে মল্লগণ তাঁহার এত প্রিয় হইয়া উঠিল যে, তিনি সর্দ্দারগণকে অপমানিত করিয়া মল্লদিগকে তাঁহাদের সম্ভ্রম প্রদান করিলেন। সর্দ্দারগণ এই নিদারুণ অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রমে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। সুযোগ পাইয়া গুর্জ্জরের মুসলমান নৃপতি বাহাদুর চিতোর আক্রমণ করিলেন; সর্দ্দারগণ কেহই প্রথমে রাণার সহায়তা করিলেন না, শেষে যখন দেখিলেন, তাঁহারা আপনাদেরই পায়ে আপনারাই কুঠার প্রয়োগ করিতেছেন, তখন তাঁহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তখন বাহাদুরের আক্রমণে চিতোর বিধ্বস্তপ্রায়।

ইতিপূর্ব্বে রাণী কর্ণাবতী দিল্লীর সম্রাট হুমায়ুনকে রাখীসূত্র প্রেরণ করিয়া ছিলেন। সেই সূত্রে সম্রাট্‌কে রাণী কর্ণাবতী ধর্ম্মভ্রাতা বলিতেন। এক্ষণে বিক্রমের বিপদের কথা শুনিয়া তিনি মোগল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মোগল সম্রাটের সৈন্যসামন্ত দেখিয়া বাহাদুর ভীত হইয়া চিতোর ছাড়িয়া আপন দেশ গুর্জ্জর-রক্ষার জন্য প্রস্থান করিলেন। হুমায়ুনের সহায়তায় বিক্রম সে যাত্রা নিরাপদ হইলেন। আবার তিনি মিবারের সিংহাসনে উপবেশন করিলেন; কিন্তু সর্দ্দারগণের প্রতি সেই বিজাতীয় ঘৃণা

তখনও তাঁহার যায় নাই। তিনি পুনরায় সর্দ্দারগণকে অপমান করিতে লাগিলেন। তখন সর্দ্দারেরা মিলিয়া তাঁহাকে সিংহাসন-চ্যুত করিলেন। শিশু উদয় সিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত রাজবংশের দাসীপুত্র বনবীরকে তৎপদে অভিষিক্ত করিলেন। বনবীর প্রথমে সর্দ্দারদিগের অনুরোধ পালন করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, কারণ বিক্রমজিৎকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া সেই সিংহাসন অধিকার করা তাঁহার বিবেচনায় ঘোর পাপাচরণ বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কিন্তু রাজ-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া তিনি পূর্ব্ব কথা সমস্ত বিস্মৃত হইলেন। রাজপদের এমনই মোহ যে, তিনি বিক্রমজিতের প্রতি সমস্ত স্নেহ ও ভালবাসা বিস্মৃত হইলেন এবং একদা রাত্রিকালে বিক্রমজিৎকে অতর্কিতভাবে তিনি হত্যা করিলেন। কিন্তু ইহাতেও বনবীরের রক্তপিপাসা কমিল না। তাঁহার সিংহাসনকে নিষ্কণ্টক করিবার পথে যতগুলি বাধা-বিপত্তি আছে সে সকল নির্ম্মূল করিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সঙ্কল্প কার্য্যেও পরিণত হইল। একদিন তিনি ছয় বৎসরের বালক উদয় সিংহের বধ-সাধনে উদ্যোগী হইলেন।

উদয় সিংহ ভোজন সমাপন করিয়া রাত্রিতে শয়ন করিয়া আছেন, ধাত্রী পান্না শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছে, এমন সময় উচ্ছিষ্ট-পরিষ্কারক নাপিত রাজপুত্রের উচ্ছিষ্টাবশেষ স্থানান্তরিত করিতে আসিয়া ভীতি-বিজড়িত কণ্ঠে বলিল, "বনবীর রাণা বিক্রমজিৎকে হত্যা করিয়াছে।" নাপিতের মুখে এই কথা শুনিয়া ধাত্রী পান্নার হৃদয় দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে বেশ বুঝিতে পারিল, বনবীরের শাণিত অসি শুধু বিক্রমজিতের শোণিতে রঞ্জিত হইয়াই কোষবদ্ধ থাকিবে না, পরন্তু অবিলম্বে তাহা শিশু উদয়সিংহেরও শির দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবে। সে যেন দিব্যনয়নে দেখিতে পাইল, বনবীর শিশুটীকে হত্যা করিবার জন্য আসিতেছে। গৃহমধ্যে একটি

বৃহৎ ফলের ঝুড়ি পড়িয়া ছিল, ধাত্রী অতি অন্তর্পণে নিদ্রিত রাজকুমারকে তন্মধ্যে স্থাপন করিল এবং কতকগুলি বৃক্ষপত্র দ্বারা সেই ঝুড়িটি সুন্দররূপে আচ্ছাদিত করিয়া সেই নাপিতের হস্তে অর্পণ করিল। ধাত্রী পান্নার আদেশে নাপিত তৎক্ষণাৎ চিতোরের ভাবী উত্তরাধিকারীকে লইয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

এদিকে ধাত্রী পান্না রাজকুমারের স্থলে নিজের শিশুপুত্রটিকে সেই স্থানে শায়িত করিয়া রাখিল। এমন সময় বনবীর অসিহস্তে প্রকোষ্ঠমধ্যে আসিয়া উদয় সিংহের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ধাত্রী পান্না বনবীরের সেই ভীষণ মূর্ত্তি-দর্শনে আর কোন কথা বলিতে পারিল না—থর থর করিয়া তাহার সমস্ত দেহ কাঁপিতে লাগিল। তিনি ইঙ্গিতে আপন পুত্রটিকে যে স্থানে শায়িত রাখিয়াছিলেন, সেই স্থান দেখাইয়া দিলেন। বনবীর আর কালবিলম্ব না করিয়া সেই তীক্ষ্ণ তরবারি ধাত্রীপুত্রের বক্ষে বসাইয়া দিলেন। মহূর্ত্তে একটি নির্দ্দোষ শিশুর রক্তে চিতোর-প্রাসাদ অনুরঞ্জিত হইল। আপনার চক্ষের সমক্ষে আপন পুত্র ঘাতকের অসির আঘাতে নিহত হইল! কর্ত্তব্যের কি কঠোরতা! ধাত্রী পান্না একবার পুত্রশোকে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে পারিল না। এমন কি বনবীরের ভয়ে একবিন্দু অশ্রু পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারিল না।

চিতোরের পশ্চিমপ্রান্তবাহিনী বেরীশ নদীর নিভৃত তীরে নাপিত রাজকুমারকে লইয়া পান্নার প্রতীক্ষা করিতেছিল। ধাত্রী তথা হইতে রাজকুমারকে লইয়া আশ্রয় জন্য নানাস্থানে ভ্রমণ করিল; কিন্তু দুরন্ত বনবীরের ভয়ে কেহ তাহাকে স্থান দিল না। পরিশেষে কমলমীরে আশা সাহ নামক এক ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া শিশু রাজকুমারকে তাঁহার ক্রোড়ে স্থাপনপূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আপনার রাজার প্রাণ আপনি রক্ষা করুন।" আশা প্রথমে বনবীরের ভয়ে

উদয় সিংহকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জননী যখন তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন, বিপদে প্রভু-পুত্রের প্রাণরক্ষা করা মহাধর্ম্ম, তখন হইতে আশা উদয় সিংহকে প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করেন।

রামমণি

বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাব একদিকে যেমন চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, বিদ্যাপতি, মুকুন্দরাম প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের সৃষ্টি করিয়াছে, তেমনি মহিলাগণের হৃদয়েও কবিত্বের উৎস নিঃসৃত করিয়াছিল। রাধাকৃষ্ণের কান্তাভাবে ভাবিতা হইয়া বাঙ্গালায় অনেক মহিলা ভাবাবেশে অনেক কবিতা ও পদাবলীর দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে বোধ হয় চণ্ডীদাস-ভক্তা রজক-কন্যা রামমণি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। চণ্ডীদাসের কবিতা ও পদাবলীর মূল উৎসই এই রামমণি।

রামমণি অতি দরিদ্র রজক-কন্যা। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ও অনশনে ক্লিষ্ট হইয়া রামমণি একদা বাঁকুড়া জেলার নান্নুর গ্রামস্থ বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন। তখন বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরের পূজক ও পুরোহিত ছিলেন চণ্ডীদাস নামে একজন ব্রাহ্মণ। চণ্ডীদাস রামমণির জীর্ণশীর্ণ কলেবর, চীরবাস ও রুক্ষকেশপাশ-দর্শনে তৎপ্রতি কৃপাপরবশ হন এবং গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণের আদেশক্রমে রামমণিকে মন্দিরের পরিচারিকা-পদে নিযুক্ত করেন। রামমণি রজক-

কন্যা হইলেও দেখিতে সে পরমা সুন্দরী ছিল—অঙ্গসৌষ্ঠবে লাবণ্য ছিল—দেবতার প্রতিও তাহার অসাধারণ নিষ্ঠা ছিল। কিছুদিন মন্দিরের সেবা করিতে করিতে এবং দেবতার প্রসাদ পাইতে পাইতে রামমণি ক্রমশঃ সুস্থ সবলকায়া হইয়া উঠিল। তাহার প্রতি অঙ্গে যৌবনের উচ্ছ্বাস প্রতিফলিত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া নান্নুর গ্রামের জমিদার হইতে নায়েব গোমস্তা পর্য্যন্ত অনেকের লোলুপ দৃষ্টি দরিদ্রা রামমণির উপর পড়িল ; কিন্তু সতীত্বের অসামান্য তেজ রামমণির ছিল। রামমণি তাহাদের অত্যাচার-উৎপীড়নকে অগ্রাহ্য করিয়া আপন সতীত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন। এদিকে চণ্ডীদাসের সহিত রামমণির অবাধ মেলামেশা-দর্শনে গ্রামের লোকজন চণ্ডীদাসের সহিত তাহার অবৈধ প্রণয় হইয়াছে, এই মিথ্যা জনরব রটাইয়া চণ্ডীদাসকে সমাজচ্যুত করিল। বস্তুতঃ পক্ষে কিন্তু তাহা নহে। চণ্ডীদাস ও রামমণি উভয়েই সাধক, গায়ক ছিলেন। উভয়েই মন্দিরে বসিয়া কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক গান করিতেন। চণ্ডীদাসকে রামমণি দেবতার ন্যায় ভক্তি ও পূজা করিতেন। চণ্ডীদাসও রামমণিকে মায়ের ন্যায় দেখিতেন। চণ্ডীদাসের একটা পদাবলী হইতে ইহা জানিতে পারা যায়। চণ্ডীদাস রামমণিকে লক্ষ্য করিয়া গাহিতেছেন—

"তুমি রজকিনী, আমার রমণী
তুমি হও মাতৃ পিতৃ।"

রামমণি কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক অনেক পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। আজিও সেগুলি গীত হইয়া থাকে। ইহাতেই বুঝা যায়, তিনি রজক-কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও বিদূষী ছিলেন।

কৃষ্ণকুমারী

কৃষ্ণকুমারী ছিলেন উদয়পুর-রাজ ভীম সিংহের কন্যা। তিনি যেমন রূপে অতুলনীয়া, তেমনি গুণেও অতুলনীয়া ছিলেন। ভট্টগণ তাঁহাকে "বীরস্থানের ফুল্ল সরোজিনী" বলিয়া আখ্যায়িত করিতেন। তিনি ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলে তাঁহার সৌন্দর্য্য এতদূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তাঁহার অবয়ব ক্ষীণ, কোমল ও উজ্জ্বল রূপরাশিতে পরিপূর্ণ। নয়ন দুইটি জ্যোতির্ম্ময়, ভ্রূযুগল সুচিক্কণ, কণ্ঠ সূক্ষ্ম, গণ্ডস্থল রক্তিমচ্ছটায় আরক্ত, মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ও লাবণ্যময়। তিনি যুবতী, তন্বঙ্গী ও সত্য সত্য সুন্দরী ছিলেন। মুখে সৌন্দর্য্য ঝল্‌মল করিত, নয়ন হইতে সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ হইত, ললিত বাহুলতা ও কমনীয় দেহলতায় সৌন্দর্য্য প্রবাহিত হইত। কাজেই সে রূপের কথা শুনিয়া রাজস্থানের রাজগণ তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। জগৎ সিংহ ও মানসিংহ নামক দুইজন রাজপুত তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। রাজা ভীম সিংহ এই সুন্দরী দুহিতা লইয়া মহাসঙ্কটে পতিত হইলেন। তাঁহার এত সেনাবল নাই যে, তিনি বিপক্ষকে দমন করিয়া স্বপক্ষ জগৎ সিংহের হস্তে কৃষ্ণকুমারীকে সম্প্রদান করেন। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। আমির খাঁ নামক পরাক্রান্ত মুসলমান আসিয়া মানসিংহের সহিত যোগদান করিল। ভীমসিংহ প্রমাদ গণিলেন। রাজা ভীমসিংহ মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিলেন, এখন কি উপায় করা যায়, কি উপায়ে কন্যা কৃষ্ণকুমারীর মান, মর্য্যাদা এবং কুলের সম্ভ্রম রক্ষা করা যায়। মানসিংহের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিলে জাতি কুল সবই যাইবে, আর না দিলেও

দুর্ব্বৃত্ত চিতোর ধ্বংস-বিধ্বংস করিয়া উহা শ্মশানে পরিণত করিবে। মন্ত্রীরা সকলে একবাক্যে পরামর্শ দিলেন যে, এখন কৃষ্ণকুমারীর আত্মবিসর্জ্জন ভিন্ন অন্য উপায় নাই। কৃষ্ণকুমারী জীবিতা থাকিতে অনল কখনও নির্ব্বাপিত হইবে না। তখন সুতীব্র হলাহল লইয়া কৃষ্ণকুমারীকে প্রদান করা হইল। কৃষ্ণকুমারীর মাতা কত অনুরোধ করিলেন, কত ক্রন্দন করিলেন, কিন্তু স্বজাতি ও সবংশবৎসলা রাজপুতবালা বংশের পবিত্রতা অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য ধীরস্থিরচিত্তে সেই হলাহল পান করিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে চিতোব মানসিংহের কবল হইতে রক্ষা পাইল।

জিজাবাই

মহারাষ্ট্রকুলতিলক, বীরেন্দ্রকেশরী শিবাজী যাঁহার অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া মহারাষ্ট্র দেশে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার জননী জিজাবাই-ই সেই অনুপ্রেরণার মূল। মায়ের শিক্ষায় যে সন্তান গড়িয়া উঠে, ইহার যদি কোন জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ থাকে, তবে জিজাবাই-ই সেই প্রমাণস্থল। জিজাবাইয়ের পিতার নাম লুখজি যাদব রাও, জাতিতে তিনি মারাঠা ছিলেন। লুখজী আমেদ-নগরের রাজ-দরবারে কোন উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মালোজি নামক এক ব্যক্তির পুত্র সাহাজির সহিত বালিকা জিজাবাইয়ের বিবাহ হয়। সাহাজি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দিল্লীতে সম্রাট্ সাজাহানের অধীনে ছয় হাজার সৈন্যদলের অধিনায়কত্ব ও দুই লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে আমেদনগরের রাজা বাহাদুর সাহের মৃত্যুতে রাজ্যে গোলযোগ হওয়ায় সাহাজি দিল্লীর কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমেদ-নগরে ফিরিয়া আসিলেন। আমেদনগরে আসিলে বাহাদুর সাহের মহিষী সাহাজির হস্তে রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করিলেন; সাহাজি রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন। তখনও লুখজি আমেদনগর সরকারে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সাহাজি তাঁহার জামাতা হইলেও, জামাতা রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা আর তিনি তাঁহার অধীন কর্ম্মচারী—এ চিন্তা তাঁহার তাঁহার সহ্য হইল না। তিনি গোপনে গোপনে দিল্লীশ্বর সম্রাট সাজাহানের সহিত ষড়যন্ত্র করিলেন, সাজাহানের লোলুপ দৃষ্টি অনেক দিন হইতেই আমেদনগরের প্রতি ছিল। লুখজির সহায়তা পাইবেন—এই আশায় সাজাহানের সেনাপতি মীর জুম্লা আমেদনগর

আক্রমণ, করিলেন। সাহাজি পরাজিত হইলেন এবং পলায়ন করিয়া বিজাপুরের রাজসরকারে কর্ম্ম লইয়া তথায় সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি যে সময়ে বিজাপুরে পলায়ন করেন, তখন লুখজি তাহার পশ্চাদনুসরণ করেন, কিন্তু সাহাজিকে ধরিতে না পারিয়া আপনার সাত মাসের গর্ভবতী কন্যা জিজাকে বন্দী করিয়া লইয়া আইসেন। আপন কন্যা বলিয়া লুখজী যে জিজাকে বিশেষ দয়া করেন তাহা নহে, বরং শত্রু-পত্নী বলিয়া তাঁহাকে শিউনীর দুর্গে বন্দী করিয়া রাখেন। বন্দিনী অবস্থায় জিজা আর কোন চিন্তা করিতেন না, কেবল ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন, ভগবান! আমাকে এরূপ পুত্র দিও, যে মুসলমানের কবল হইতে হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে। চিকিৎসকেরা বলেন, সন্তান গর্ভস্থ থাকাকালে মাতা যে-ভাবে চিন্তা করেন সন্তানও ঠিক তদনুরূপ হয়। জিজাবাই বীর পুত্রের কামনা করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিল, তিনিও পরিণামে বিশ্ববিখ্যাত বীরে পরিণত হইয়াছিলেন।

শিবাজীর বয়স যখন বিংশতি বৎসর তখন তিনি জমিদারী ও জায়-গীর লাভ করেন। জিজাবাই শিবাজীকে জমিদারী-পরিচালনে উপদেশ প্রদান ও সাহায্য করিতে লাগিলেন। শিবাজী মাতা জিজাবাইয়ের পরামর্শকে এত সমীচীন মনে করিতেন যে, তিনি মাতার পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্য্যই করিতেন না। বিজাপুরের সুলতান-পুত্রের প্রতিনিধিরূপে যখন আফজল খাঁ শিবাজী-রাজ্যে অগ্রসর হইবার পথে ভবানীমন্দির ধ্বংস ও বহু তীর্থযাত্রীকে হত্যা করেন, তখন মাতা জিজাবাই শিবাজীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং হিন্দু জাতি ও হিন্দু তীর্থের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে যে কোন বিপদের সম্মুখীন হইতে বলিয়াছিলেন। শিবাজীর রণচাতুর্য্যে সেনাপতি আফজল খাঁ নিহত হইয়াছিলেন। শিবাজীর পিতা সাহাজী

তখনও বিজাপুরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহার চেষ্টায়, শিবাজী বিজাপুরের সহিত সন্ধি করেন। অতঃপর মোগলের সহিত শিবাজীর যুদ্ধ বাধে। শিবাজী সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আমন্ত্রণে দিল্লীতে পুত্র শম্ভুজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, এই সময়ে জিজাবাই শিবাজীর রাজ্য শাসন করিতেন। শিবাজীকে ঔরঙ্গজেব যথোপযুক্ত সম্মান না করিয়া তাঁহাকে বন্দী করেন। শেষে শিবাজী মিষ্টান্নের ঝুড়িতে শম্ভাজীকে লইয়া বন্দী অবস্থা হইতে কৌশলে বাহির হইয়া সন্ন্যাসীর বেশে স্বরাজ্য রায়গড়ে ফিরিয়া আসেন। তার পর শিবাজী "রাজা" উপাধি গ্রহণ করেন। জননী জিজাবাই স্বহস্তে শিবাজীকে রাজবেশ পরাইয়া দেন। অতঃপর তুকারাম নামক এক সাধুর সংস্পর্শে আসিয়া শিবাজী সংসার পরিত্যাগ করিয়া বনে সন্ন্যাসধর্ম্ম উদ্‌যাপন করিতে থাকেন, জিজাবাই তুকারামের নিকট গিয়া শিবাজীকে আবার রায়গড়ে ফিরাইয়া আনেন এবং কর্ম্মযোগী হইয়া কর্ম্ম করিবার জন্য দীক্ষা দিয়া সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেন।

অহল্যা বাঈ

১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে মালব দেশের অন্তর্গত একটি সামান্য পল্লীতে অহল্যা বাঈ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃবংশ সিন্ধিয়া নামে পরিচিত ছিলেন—সিন্ধিয়া রাজবংশের সহিত তাঁহার পিতৃকুলের পরিচয় ছিল। মলহর রাও হোলকারের একমাত্র পুত্র কুন্দ রাওয়ের সহিত অল্প বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। কুন্দ রাও পিতার জীবদ্দশায় ভরতপুরের নিকট-বর্ত্তী কুম্ভীর নামক কোন দুর্গ অবরোধের সময় প্রাণত্যাগ করেন। তখন অহল্যার বয়স মাত্র উনবিংশতি বর্ষ। সেই সময় তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার বৈধব্যের একাদশ বর্ষ পরে, অহল্যার ত্রিংশৎ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার শ্বশুর মলহর রাও পরলোক গমন করেন। মলহর রাওয়ের মৃত্যুর পর সমস্ত রাজ্যের ভার তাঁহার উপর পতিত হয়। অহল্যা অতি শোক ও অশান্তির মধ্যে রাজ-সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার পুত্র মল্ল রাও অতি অসৎপ্রকৃতি ও দুর্ব্বৃত্ত ছিল। নিজের অসদাচারের জন্যই অতি তরুণ বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

বৈধব্যের পর হইতে অহল্যা আপনার জীবন দেব-ব্রাহ্মণের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন। অহল্যার শ্বশুর মলহর রাও অধিকাংশ সময় যুদ্ধ-বিগ্রহাদিতে অতিবাহিত করিতেন বলিয়া তিনি গঙ্গাধর যশোবন্ত নামক এক ব্রাহ্মণকে প্রধান মন্ত্রী বা দেওয়ান-পদে নিযুক্ত করিয়া-ছিলেন। যশোবন্ত অতি কূটবুদ্ধি ও স্বার্থপর পুরুষ ছিলেন। তিনি অহল্যার ভরণ-পোষণের জন্য মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া হোলকার-বংশীয় কোন শিশুকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি তাৎকালিক মহারাষ্ট্র-চক্রের অন্যতম নেতা ও

পেশোয়ার পিতৃব্য রাঘব দাদাকে উৎকোচ দান করিয়া বশীভূত করিলেন। রাঘব অহল্যার সহিত যুদ্ধ করিবার আয়োজন করিলেন। অহল্যাও এই সংবাদ পাইয়া সমরায়োজন করিলেন। অহল্যা স্বয়ং সৈন্যসমূহের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। তদ্দর্শনে রাঘব দাদা ভীত হইয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ করিলেন। বিনা শোণিতপাতে সমস্ত বিবাদের মীমাংসা এইভাবে সমাপ্ত হইল। যুদ্ধান্তে অহল্যা তুকাজী হোলকার নামক মলহর রাওয়ের সম্পকায় জনৈক বীরপুরুষকে আপনার সেনাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

তিনি নিজে রাজ্ঞী হইয়া তপস্বিনীর ন্যায় কঠোর নিয়মে দিনপাত করিতেন, কাজেই সাম্রাজ্যের আকর্ষণ যে তাঁহার বেশী ছিল না, এ কথা বলাই বাহুল্য। একদিকে নারীসুলভ কোমলতা ও অপর দিকে পুরুষোচিত কাঠিন্য তাঁহার প্রকৃতিতে যেরূপ সুন্দররূপে সম্মিলিত দেখিতে পাওয়া যায় যে, অতি অল্প ঐতিহাসিক রাণীর মধ্যেই সেরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভোগ-সুখের বা প্রভুত্ব প্রদর্শনের জন্য তিনি রাজ্যাভি-লাষিণী ছিলেন না। তিনি তুকাজীর হস্তে রাজ্যের পুরুষোচিত কার্য্যের ভার সমর্পণপূর্ব্বক স্বয়ং নারীজনোচিত লঘুভার গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। অহল্যা তাঁহার সহায়তায় নিশ্চিন্ত হইয়া প্রজাপুঞ্জের কল্যাণ-সাধনে ও ধর্ম্মানুশীলনে নিযুক্ত থাকিতেন। অহল্যার মৃত্যুর পর তুকাজী মলহর রাওয়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তুকাজীর বংশধরগণই এক্ষণে ইন্দোরে রাজত্ব করিতেছেন। অহল্যার শ্বশুর বাহুবলে হোলকার-বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু অহল্যার জন্যই সে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উন্নতি ও শৃঙ্খলা সাধিত হইয়াছিল। তিনি রাজ্যের আয়-ব্যয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিতেন, তাঁহারই সুব্যবস্থার গুণে সে সময়কার দেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে হোলকার রাজ্য একটি প্রধান সমৃদ্ধিশালী রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। প্রজাগণের

সুখ ও শান্তি অহল্যার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। অহল্যা অবাধে প্রকাশ্য রাজসভায় প্রবিষ্ট থাকিয়া রাজকার্য্যালোচনা করিতেন। প্রজাগণের সকল প্রকার আবেদন তিনি স্বয়ং স্বকর্ণে শ্রবণ করিতেন। তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান এরূপ প্রবল ছিল যে, বিচারপ্রার্থীর আবেদন অতি সামান্য হইলেও সবিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া তিনি কখনও কোন আজ্ঞা প্রদান করিতেন না। তিনি প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিতেন, প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া সন্ধ্যা-বন্দনাদির পর তিনি নিয়মিতরূপে রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ ইত্যাদি শ্রবণ করিতেন। সেই সময়ে তাঁহার দ্বারদেশে বহুসংখ্যক ভিক্ষুক সমাগত হইত। অহল্যা স্বহস্তে তাহাদিগকে ভিক্ষা দিতেন এবং তাহার পর নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইয়া স্বয়ং যৎকিঞ্চিৎ আহার করিতেন। নিজের পানাহার সম্বন্ধে তিনি অতি নিষ্ঠাবতী ছিলেন। তিনি যে মহারাষ্ট্রীয় জাতির অন্তর্ভুক্ত তাহাদের বিধবাদের পক্ষে মৎস্য-মাংসাহার যদিও নিষিদ্ধ নহে—তথাপি অহল্যা বাঈ কখনও মৎস্য মাংস স্পর্শ করিতেন না। আহারের পর সামান্য ক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তিনি রাজসভায় যাইয়া বসিতেন এবং সেখানে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে রাজকার্য্য করিতেন। অপরাহ্নে সভা ভঙ্গ হইবার পর অন্যূন তিন ঘণ্টা কাল তাঁহার সায়ংসন্ধ্যা, পূজা ইত্যাদিতে অতিবাহিত হইত। এইরূপে দৈনিক সমস্ত কার্য্য শেষ হইলে রাত্রি প্রায় ১১টার সময় তিনি শয়ন করিতেন। দেবপূজা, উপবাস ও রাজকার্য্য—এই তিন বিষয়ে তাঁহার কখনও ঔদাস্য ও আলস্য ছিল না। মহারাষ্ট্রদেশে যত প্রকার উৎসব ও ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রচলিত আছে, সকলগুলিই তিনি অতি যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিত সম্পাদন করিতেন। ব্রত, পূজা, উপবাস প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত কোন রূপ

অনুষ্ঠানেই তাঁহার ঔদাসীন্য ছিল না, অথচ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিষয়-কর্ম্ম-পরিদর্শনেও তিনি পরাঙ্মুখী হইতেন না।

অহল্যা বাঈ যখন সিংহাসনে অধিরূঢ়া ছিলেন, তখন মধ্যভারতে আদৌ শান্তি ছিল না। একদিকে লুণ্ঠনকারী দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ, অন্যদিকে জাঠ, রোহিলা, পিণ্ডারী প্রভৃতি নানা জাতীয় নানা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়স্থ সৈনিক দস্যুগণের উপদ্রবে মধ্যভারত তখন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় যে অহল্যা বাঈ আপনার রাজ্যে শান্তি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন ইহা তাঁহার পক্ষে অতীব গৌরবের বিষয়। তাঁহার প্রতিবাসী সমর-লোলুপ রাজন্যবর্গের মধ্যেও কেহ কখন তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে সাহস করে নাই। অহল্যা বাঈ তাঁহার অনুজীবিগণের প্রতি এরূপ স্নেহবতী ছিলেন যে, তাঁহার দীর্ঘ রাজত্বকালের মধ্যে কখনও মন্ত্রী পরিবর্ত্তন করিতে হয় নাই এবং অন্যান্য কর্ম্মচারিগণের মধ্যেও কচিৎ কখনও কাহাকেও পরিবর্ত্তিত করিতে হইয়াছিল। অহল্যার সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব্বে ইন্দোর একটি সামান্য পল্লীমাত্র ছিল, তাঁহারই সময়ে ইহা সমৃদ্ধিশালিনী নগরীতে পরিণত হয়। তাঁহার এইরূপ নিয়ম ছিল যে, রাজকোষের উদ্বৃত্ত অর্থ একত্র করিয়া তিনি তাহার উপর অঞ্জলিপ্রদান, গঙ্গাজল এবং কতকগুলি তুলসীপত্র নিক্ষেপ করিতেন। তদবধি সেই অর্থ কেবলই নানারূপ সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইত, কস্মিন্ কালেও তাহার এক কপর্দ্দকও অন্য কোন কার্য্যে ব্যয় হইতে পারিত না। তাঁহার দয়া ও বদান্যতা কেবলই তাঁহার নিজ রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতবর্ষের যেসকল স্থান হিন্দুধর্ম্মমতে পবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহার প্রায় সর্ব্বত্রই তাঁহার কীর্ত্তি বর্ত্তমান আছে। জগন্নাথ-যাত্রিগণের গমনাগমনের জন্য তিনি যে প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, জীর্ণ এবং অসংস্কৃত অবস্থায় এখনও তাহা সহস্র সহস্র পথিকের ক্লেশ নিবারণ

করিতেছে। কাপ্তেন ষ্টুয়ার্ট নামক জনৈক সৈনিক কর্ম্মচারী ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে হিমালয়স্থিত কেদারনাথ তীর্থে ভ্রমণ করিতে যাইয়া দেখেন যে, তিন হাজার ফুট উর্দ্ধে যেখানে অপর মনুষ্যাবাসমাত্র নাই, সেখানে অহল্যা পথিকদিগের বিশ্রামের জন্য ধর্ম্মশালা ও কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। শুধু বড় বড় তীর্থক্ষেত্র নহে, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তীর্থস্থানেও তিনি অর্থসাহায্য করিতেন। দাক্ষিণাত্যের বহু তীর্থের দেবমূর্ত্তি ও মন্দির প্রতিদিনই তাঁহার প্রদত্ত গঙ্গাজলে ধৌত হইত। গঙ্গাজল আনিতে বহু শত ভারবাহী নিযুক্ত ছিল। তৃষ্ণার্ত্ত মহিষ ও গরুর তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পথে ঘাটে তাঁহার ভৃত্যগণ জলপাত্রহস্তে দণ্ডায়মান থাকিত। তিনি স্বয়ং একটি বৃহৎ ক্ষেত্র পক্ষীদিগের আহার্য্য শস্যে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তীর্থক্ষেত্রে গমনের সময় তিনি নানাবিধ বৃক্ষের বীজ সঙ্গে লইয়া যাইতেন এবং সযত্নে রোপণ করিয়া আসিতেন। রৌদ্রতপ্ত পথিক বীজোদ্ভূত বৃক্ষগুলির তলে বিশ্রাম করিবে, ক্ষুধাতুরগণ তাহাদিগের ফলে তৃপ্তিলাভ করিবে, এই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

অহল্যার একমাত্র পুত্র মল্ল রাওয়ের মৃত্যুর পর অহল্যার দুহিতা মুক্তা বাঈ অহল্যার সাংসারিক শান্তি ও সান্ত্বনাস্থল হইয়াছিলেন। মুক্তার পুত্রটিকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। কিন্তু মুক্তার পুত্র যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অহল্যার সমক্ষেই প্রাণত্যাগ করিলেন এবং সে ঘটনার পর এক বৎসর অতীত হইতে না হইতে পুত্রশোকাতুরা অহল্যাও নিজে বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইলেন। মুক্তা স্বামীর সহিত একই চিতায় সহগামিনী হইলেন। এইভাবে নির্ব্বিবাদে ত্রিশবৎসর কাল রাজত্ব করিবার পর ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে পুণ্যশ্লোকা অহল্যা বাঈ সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেন। তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্বকালে কোন প্রকার যুদ্ধবিগ্রহাদি হয় নাই। মহারাষ্ট্র দেশে অহল্যা বাঈ

সম্বন্ধে একটি গাথা প্রচলিত আছে, সেই গাথা হইতে রাণী অহল্যা বাঈয়ের কতকটা পরিচয় পাওয়া যায় :—

"কলিযুগে ধন্যা সতী অহল্যা রাণী,
(ও) যাঁর কীর্ত্তিতে ভরেছে ভুবন, নারীর মাঝে রত্নখনি ;
যাঁরে দেখলে নয়নে—পাপ থাকে না মনে,
রোগের জ্বালা পালায় দূরে এমনি "পুণ্য পরাণী"

* * * *

কত কঠোর ব্রত পণ তিনি কর্‌লেন উদ্‌যাপন,
হ'লেন ধর্ম্মবলে পুণ্যফলে আপনকুল-উদ্ধারিণী ;
(ও) সেই মহেশ্বর ধাম, যেথা কর্‌তেন অধিষ্ঠান,
কাঙ্গাল গরীব গেলে সেথায় লভিত বিশ্রাম।
তিনি মাতা হ'য়ে দিতেন অন্ন দীনহীনের জননী।

* * * *

অর্গলের রাণী

সাত শত বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। বর্ত্তমান এলাহাবাদ নগরের নিকটে অর্গল নামে একটি হিন্দু রাজ্য ছিল। গৌতম ছিলেন অর্গলের অধিপতি। তাঁহার পত্নী অসামান্য সুন্দরী ও গুণশালিনী ছিলেন, এজন্য রাণী প্রজামাত্রেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি শুধু রূপ ও গুণের অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন না, তিনি বীরাঙ্গনাও ছিলেন। তিনি কিরূপে তাঁহার অতুল পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহাই বলিতেছি।

গৌতম যখন অর্গলের রাজা, সম্রাট্ নাসিরুদ্দীন সাহ তখন দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন। গৌতম দিল্লীশ্বরকে কর দিতে অস্বীকার করিলেন। ক্ষুদ্র হিন্দু রাজার এবম্প্রকার স্পর্দ্ধা দিল্লীর অধিপতির নিকট অসহনীয় বলিয়া বোধ হইল। অবিলম্বে তিনি অযোধ্যার মুসলমান শাসনকর্ত্তাকে সৈন্য-সামন্ত লইয়া অর্গলের রাজার দর্প চূর্ণ করিবার জন্য যাইতে আদেশ করিলেন। অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা সৈন্য-সামন্ত সহিত মহাদর্পে অর্গল রাজাকে উচিত-মত শিক্ষা দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, কিন্তু সম্মুখ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সমস্ত গর্ব্ব খর্ব্ব হইল। অর্গলরাজের সেনা-পতিত্বে সহস্র সহস্র অর্গলবাসী মাতৃ-ভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সমবেত হইয়াছে, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাহারা প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছে, মোগল সেনাপতি তাহাদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া লজ্জাবনত শিরে ফিরিয়া আসিলেন। জয়োন্মাদে উল্লসিত অর্গলের প্রজাবৃন্দকে রাজা রাণীর প্রস্তাবানুসারে প্রাসাদে আমন্ত্রণ করিয়া মহাসমারোহে আপ্যায়িত করিলেন। রাণী আগত রমণীগণকে স্বহস্তে খাদ্যপানীয় পরিবেশন করিয়াছিলেন।

একদিন উৎসব-শেষে রাণী সহচরীদের সহিত প্রাসাদশীর্ষ হইতে শুক্ল পক্ষের চাঁদ দেখিতে দেখিতে গঙ্গাস্নানের তিথি সমাগত মনে করিয়া গঙ্গা স্নান করিবার প্রবল বাসনা তাহাদিগকে জানাইলেন। কিন্তু পুণ্যতোয়া ভাগীরথী ত নিকটে নহে। বিশেষতঃ যুদ্ধে পরাজিত, অবমানিত মোগল সৈন্য তখনও প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ভাগীরথীর কূলে কূলে শিবির সংস্থাপন করিয়া অবস্থান করিতেছে। রাণী ভাবিলেন, তবে কি এই সব মোগল আততায়ীর জন্য তাঁহার ইহকাল ও পরকালের পথ পরিষ্কৃত হইবে না? লক্ষ লক্ষ লোক গঙ্গা স্নান করিবে আর তাঁহার ভাগ্যে গঙ্গা স্নান হইবে না? সহচরীদের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি স্নানের দিন নিরাভরণা অবস্থায় ছদ্মবেশে গঙ্গাস্নানে যাইতে সঙ্কল্প করিলেন। পাছে রাজা কোনরূপ আপত্তি করেন—এই আশঙ্কায় রাণী রাজাকে বিন্দুবিসর্গ না জানাইয়া স্নানের পূর্ব্বদিন রাত্রিতে কয়েক জন সহচরীকে লইয়া গঙ্গাস্নান করিতে যান। তিনি যে বকসার ঘাটে স্নান করিতেছিলেন, সেই বকসার ঘাটেরই অনতিদূরে মোগল সেনাপতি শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন।

রাণী যতই নিরাভরণাবস্থায় ছদ্মবেশে স্নানার্থ যাউন না কেন, তাঁহার তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ বর্ণ, অনুপম দেহসৌন্দর্য্য স্নানার্থিনী সকল রমণীর দেহসৌন্দর্য্যকে ছাপাইয়া তুলিয়াছিল। কাজেই সকলে অনিমেষ-নয়নে শুধু এই রূপসৌন্দর্য্যের মূর্ত্তিমতী রাণীকে দেখিতেছিল। ক্রমে কাহারও আর সন্দেহ রহিল না যে, এই অসামান্য সৌন্দর্য্যময়ী নারী—অর্গলের রাণী। শিবিরে বসিয়া গুপ্তচরের মুখে এই সংবাদ শুনিয়া দুর্দ্ধর্ষ মোগল সেনাপতি মনে মনে ভাবিলেন, যদি এই রমণীটিকে ছলে, বলে, কৌশলে কোন ক্রমে হস্তগত করিয়া দিল্লীশ্বরের নিকট উপহার পাঠাইতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার উপর তাঁহার শুভ দৃষ্টি

পড়িবে। ইহা স্থির করিয়া তিনি রাণীর প্রত্যাগমন-পথে-সারিবদ্ধ ভাবে মোগল সৈন্য মোতায়েন করিয়া রাখিলেন।

গঙ্গাস্নানান্তে রাণী নববস্ত্র পরিধান করিয়া যখন গৃহ-গমনের জন্য নদীতীরের অনতিদূরে রাজপথে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন দেখিতে পাইলেন, সারি সারি, দলে দলে সশস্ত্র মুসলমান সৈন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দেখিলেন, তাঁহার সঙ্গে কোন রক্ষক নাই, পশ্চাতে নদী-তীরে শুধু নিরস্ত্র নিরীহ হিন্দুযাত্রিদল। ক্রোধে, ঘৃণায় একবার সহ-চরীদের প্রতি তাকাইলেন এবং আপন ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। দেখিতে দেখিতে মুসলমান সৈন্যগণ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাণী ইহাতে একটুও ভীতা না হইয়া মুসলমান সৈন্যগণকে লক্ষ্য করিয়া তার স্বরে বলিলেন, "পরাজিত মুসলমান সেনাপতিকে ধিক্! মুসল-মান সেনাদিগকে ধিক্! দিল্লীর অধীশ্বরকেও ধিক্! পরাজিত কাপুরুষের অধম, তাই নিরস্ত্র স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার ভিন্ন পরা-জয়ের প্রতিশোধ লইতে অন্য উপায়ে অক্ষম। তোমরা আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছ, তোমরা সৈনিক, না ফেরুপাল? যদি সৈনিক হইতে, তাহা হইলে আজ এইভাবে চোরের মত কুলনারীর অবমাননা করিতে অগ্রসর না হইয়া অর্গলের সৈন্যদের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইতে। আজ কি অর্গলের রাজবীরদের মধ্যে একটি বীরও এখানে উপস্থিত নাই? যদি থাকিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইতাম, কেমন করিয়া রাজপুতবীর একাকী তাহার রমণীর সম্মানরক্ষার জন্য সম্মুখযুদ্ধ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে।"

এমন সময় রাণী পশ্চাৎ হইতে শুনিতে পাইলেন, একদল লোক চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "রাণীজি কি জয়!" সঙ্গে সঙ্গে একদল তরুণ যুবক অস্ত্র লইয়া সেই মুসলমান সেনার মধ্যে অবতীর্ণ হইল। তাহাদের অব্যর্থ অস্ত্র-চালনায় মুসলমান সৈন্য

একে একে ভূমিতল আশ্রয় করিতে লাগিল। কিন্তু করিলে কি হয়? সেই বিরাট্ মুসলমান সেনাকে নির্ম্মূল করা ত ২।৪ জন রাজপুত-বীরের সাধ্যায়ত্ত নহে। একজন মুসলমান সেনা নিহত হইলে, অমনি দশজন আসিয়া তাহার শূন্য স্থান পূর্ণ করে। কিন্তু তথাচ রাজপুত-বীরের অচল—অটল—দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। প্রাণ দিয়াও তাহারা রাজরাণীর ধর্ম্ম ও মর্য্যাদা রক্ষা করিবে। অভয় চাঁদ ও নির্ভয় চাঁদ নামে দুইজন রাজপুতযুবক এই ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক। তাঁহারা অর্গলের রাণীকে চিনিতেন, মুসলমানদিগের অতর্কিত সৈন্য সাজান ও রাণীর একাকিনী রক্ষিহীনভাবে প্রত্যাবর্ত্তন—এই উভয় দৃশ্য দেখিয়া তাঁহারা গঙ্গা স্নান ফেলিয়া রাখিয়া অন্য কয়েকটি যুবককে সঙ্গে লইয়া রাণীর পশ্চাদনুসরণ করেন এবং মুসলমান সৈন্যেরা যখন রাণীকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করে তখন তাঁহারা "মাভৈঃ" বলিয়া আততায়ীদিগের সমক্ষে উপস্থিত হন। তাঁহারা শত্রুসেনা বধ করিতে করিতে অর্গলের রাণী ও তাঁহার সহচরীদিগকে মধ্যস্থলে লইয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকেন। অবিলম্বে অর্গল-রাজের নিকটও এ সংবাদ পৌঁছে। তিনি আর কাল-বিলম্ব না করিয়া বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া উপস্থিত হন। এবার রাজসৈন্যের সহায়তায় দ্বিগুণতর বল লইয়া পূর্ব্বোক্ত রাজপুত বীরগণ কঠোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় এবং মুসলমান সৈন্যদিগকে নিহত করিতে করিতে রাণীকে নিরাপদে অর্গল-প্রাসাদে লইয়া আসে। বীর রাজপুত দলের দুই জনের মধ্যে একজন নির্ভয়চাঁদ সেই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু অভয়চাঁদ তখনও বাঁচিয়াছিল। রাজা ও রাণী অভয়চাঁদের প্রতি অসীম স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ আপন দুহিতার সহিত অভয়চাঁদের বিবাহ দেন। শুধু বিবাহ নহে, যৌতুকস্বরূপ তাঁহাকে ভাগীরথীর উত্তরবর্ত্তী সমস্ত ভূখণ্ড প্রদান ও "রাও" উপাধি প্রদানও করেন।

তারাবাই

তারাবাই মহারাষ্ট্রকুলের গৌরব। মোগল-সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের বিপুল সেনাবাহিনীকে তুচ্ছ করিয়া ইনিই মহারাষ্ট্রে শিবাজীর বংশধরগণের শক্তি অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। শিবাজীর মৃত্যুর পর ঔরঙ্গজেব দক্ষিণ ভারতে একাধিপত্য করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শিবাজীর মৃত্যুর পরে শম্ভুজী পিতৃসিংহাসনে বসিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু মন্ত্রিগণ বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, শম্ভুজী চরিত্র দোষ-দুষ্ট, কাজেই রাজ্যশাসনে অপটু। তাঁহারা শিবাজীর দ্বিতীয় পুত্র রাজারামকে রায়গড়ের সিংহাসনের নামমাত্র উত্তরাধিকারী করিয়া নিজেরাই রাজ্যশাসন ও মোগল শত্রুর হাত হইতে রাজ্য রক্ষা করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু শম্ভুজী সেনাপতির সাহায্যে রায়গড় সিংহাসন অধিকার করিয়া যেসমস্ত কর্ম্মচারী তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে কাহাকেও বা বন্দী এবং কাহাকেও বা হত্যা করে। বালক রাজারামকে সে বন্দী করিয়া রাখে। তারাবাই এই রাজারামের স্ত্রী।

অতঃপর গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্য জয় করিয়া ঔরঙ্গজেব মহারাষ্ট্র আক্রমণ করিলেন। শম্ভুজী বন্দী হইলেন এবং অতি নৃশংসভাবে ঔরঙ্গজেবের সেনানীদের হস্তে তাঁহাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইল। শম্ভুজীর শিশুপুত্র সাহুকে ঔরঙ্গজেব নিজের নিকট রাখিয়া যত্নের সহিত প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে রাজারাম বিংশতিবর্ষীয় যুবকে পরিণত হইলেন। মারাঠীরা তাঁহাকে মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাজারাম রায়গড় মোগল কর্ত্তৃক অধিকৃত দেখিয়া জিঞ্জি দুর্গে গিয়া

মারাঠী বীরদের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। সাহু মহারাষ্ট্র রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া রাজারাম সাহুর নামে তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ দেশ শাসন করিতে লাগিলেন। মারাঠা জাতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক সৈন্যদল গঠন করিয়া ফেলিল এবং সম্মুখ যুদ্ধে বিপুল মোগলসেনার সহিত তাহারা আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না, এই জন্য পর্ব্বতে, কন্দরে লুকাইয়া থাকিয়া অতর্কিতভাবে মোগল সৈন্যকে আক্রমণ এবং তাহাদের রসদ ও খাদ্যসম্ভারাদি লুণ্ঠন করিতে লাগিল। সাত বৎসরকাল মোগল আক্রমণ হইতে জিঞ্জি দুর্গ রক্ষা করিয়া অবশেষে উহা মোগলহস্তে দিতে বাধ্য হইয়া রাজারাম সসৈন্যে মহারাষ্ট্রদেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং অল্পসংখ্যক মারাঠী সৈনিকদের নেতৃত্বভার লইয়া মোগল সৈন্যদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিলেন; কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই ১৭০০ খৃষ্টাব্দে রাজারামের মৃত্যু হইল। সৈনিকগণ তখন রাজারামের শিশু পুত্র দ্বিতীয় শিবাজিকে মহারাষ্ট্র-সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। তারাবাই পুত্রের হইয়া রাজ্যশাসন ও মোগল শক্তির সহিত লড়াই করিতে লাগিলেন। তারাবাইয়ের তেজস্বিতা-দর্শনে সৈন্যগণ সকলে রাজারামের বিচ্ছেদ-শোক ভুলিয়া গেল। এইভাবে কুড়ি বৎসর কাল কাটিয়া গেল। ঔরঙ্গজেব এই দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া মহারাষ্ট্র শক্তিকে পরাজিত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা, করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। শোকে, দুঃখে, লজ্জায়, অপমানে ও হতাশ্বাসে তিনি আমেদনগরে আসিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বাহাদুর সাহ সম্রাট্ হইয়া সাহুকে মুক্তি দান করেন। সাহু মহারাষ্ট্রে গিয়া উপস্থিত হইলে রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া অনেকেই তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিল। চিরকাল মোগল-সংসারে লালিত-পালিত বলিয়া সাহু মোগল শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইল না, বাহাদুর সাহের উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইল। বালাজি

বিশ্বনাথ নামক দ্বিতীয় মন্ত্রী বা "পেশোয়া" প্রকৃত পক্ষে সাহুর মন্ত্রিস্বরূপ' দেশশাসন করিতে লাগিলেন। সাহু আসিয়া মহারাষ্ট্র-সিংহাসনে বসিবার পূর্ব্বে মারাঠী শক্তি ভারতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক শক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শিবাজীর মৃত্যুর পর যে মহারাষ্ট্র রাজ্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল, পেশোয়া তাহা সুশৃঙ্খল করেন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে বালাজি বিশ্বনাথের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র প্রথম বাজীরাও পেশোয়া হন। বাজীরাও পিতাপেক্ষা আরও যোগ্য মন্ত্রী ছিলেন এবং তাঁহার মন্ত্রণা-গুণে মহারাষ্ট্র শক্তিকে আরও শ্রেষ্ঠ করিয়া তুলেন। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে সাহু মন্ত্রীর হস্তে রাজ্য-শাসনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ন্যস্ত করেন। তদবধি শিবাজীর বংশধরেরা রাজ্যের নামমাত্র রাজা থাকেন, প্রকৃত পক্ষে পেশোয়ারাই রাজ্য শাসন করিত। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ সাহ মহারাষ্ট্রদিগকে দাক্ষিণাত্যের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করেন এবং চৌথ ও সর্দ্দেশমুখী কর আদায় করিতে অনুমতি দেন। অতঃপর বাজীরাও মালব, গুজরাট ও বুন্দেল খণ্ড অধিকার করেন। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে বাজীরাওয়ের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পুত্র বালাজি বাজীরাও পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এদিকে তারাবাই শিবাজীর রাজ্যে শিবাজীর বংশধরদিগের কোন আধিপত্য থাকিল না দেখিয়া রোষে, ক্ষোভে দ্বিতীয় শিবাজীকে লইয়া কোহ্লাপুরে রাজধানী স্থাপন করিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে দ্বিতীয় শিবাজীর মৃত্যু হওয়ায় রাজা রামের দ্বিতীয় পুত্র শাম্বজীকে কোহ্লাপুরের সিংহাসনে বসান হয়। কিন্তু পেশোয়ার প্রাধান্যই অধিক হইয়া উঠিল। তারাবাই ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া মনো-দুঃখে কাল কাটাইতে লাগিলেন। পেশোয়া মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠেন, তারাবাইয়ের ইহা আদৌ স্পৃহণীয় ছিল না। কিছুদিন পরে সাহুর মৃত্যু হইল, তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে

তারাবাইয়ের পৌত্র রামরাজাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন, রাজ্যের কর্তৃত্ব-ভার যথারীতি পেশোয়ার হাতে থাকিল। কিছুকাল পরে পেশোয়া এক যুদ্ধে যাত্রা করেন, ইত্যবসরে তারাবাই তাঁহাকে বলেন, "বাবা! তোমার পূর্ব্বপুরুষের সিংহাসনে তুমি কাপুরুষের মত পেশোয়ার হাতের ক্রীড়নক হইয়া থাকিও না; পেশোয়া এখন রাজ্যে নাই, ইত্যবসরে তোমার ক্ষমতা তুমি বুঝিয়া লও।" কিন্তু ভীত, দুর্ব্বলচিত্ত রামরাজা পেশোয়ার ভয়ে কোন মতে তারাবাইয়ের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তখন তারাবাই তাঁহাকে কুলাঙ্গার, কাপুরুষ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া এবং তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া নিজেই রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু দুর্দ্ধ পেশোয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া তারাবাইয়ের হস্ত হইতে রাজ্য-ভার কাড়িয়া লইলেন। তারাবাই অবশিষ্ট জীবন মর্ম্মাহত অবস্থায় কাটাইয়াছিলেন।

রাণী দুর্গাবতী

এদেশের নারীকুল যেমন একদিকে অসূর্য্যম্পশ্যারূপে অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকিয়া ব্রত, পূজা প্রভৃতি হিন্দুমহিলোচিত ক্রিয়া-কর্ম্মে দেবী ভাব প্রস্ফুটিত করিতে পারেন, তেমনি স্বদেশের ও জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে তাঁহারা ভীষণ সমর-ক্ষেত্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ রাণী দুর্গাবতী।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর কথা। তখন সম্রাট্ আকবর দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট। সে সময়ে মধ্যপ্রদেশে গড়মণ্ডল নামে একটি রাজ্য ছিল। রাজ্যটি ক্ষুদ্র হইলেও ইহার চতুর্দ্দিকে সমুচ্চ পর্ব্বতসমূহ থাকায় ইহা যেমন দুর্ভেদ্য তেমনই সহসা বহিঃশত্রুর নিকট অপরাজেয় ছিল। গড়মণ্ডলের অধিপতি দলপৎ সাহ বীরত্বে, শৌর্য্যে ও বীর্য্যে তখনকার দিনে অনেক ক্ষত্রিয়ের ভীতির পাত্র ছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া মহবা রাজ্যের রাজকন্যা তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন। বীর রমণী বীরপুরুষকেই ভালবাসে; বীর যে সেও বীর রমণী প্রার্থনা করে। কোমল কঠোরকে চায়, আবার কঠোরও কোমলকে চায়। কিন্তু মহবা রাজ্যের রাজার নিকট এই বিবাহের প্রস্তাব যাইলে তিনি ঘৃণাভরে তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন, যেহেতু দলপৎ সাহ তাঁহার অপেক্ষা নাকি বংশমর্য্যাদায় নিকৃষ্ট ছিলেন। রাজকুমারী দুর্গাবতী পিতার ঈদৃশ আদেশে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন. সমাজের এ কি কঠোর অবিচার! মানুষের সৃষ্ট জাতিভেদের শৃঙ্খলে সমাজ এমনই ভাবে বাঁধা যে, কেহ কাহারও স্বাধীনতা প্রকাশ করিতে পারিবে না। তিনি প্রকাশ্যে সখীদের বলিলেন, "আমার পিতা যাহাই বলুন, আমি মনে মনে যখন একবার দলপৎকে স্বামিত্বে বরণ করিয়াছি,

তখন তিনিই আমার ইহজন্মের আরাধ্য দেবতা, আমি অন্য কাহাকেও স্বামিত্বে বরণ করিয়া কি দ্বিচারিণী হইব? মনে মনে সঙ্কল্প করিলেও যে ফল, কার্য্যে তাহা পরিণত করিলেও সে ফল। সুতরাং পিতা দলপতের সহিত আমার বিবাহ দিউন বা না দিউন, দলপতই আমার স্বামী।”

সখীরা বলিলেন, “আচ্ছা বুঝিলাম, না হয় মনে মনে দলপতকে তুমি পতিত্বে বরণ করিয়াছ, কিন্তু তাঁহার সহিত তোমার মিলন হইবে কি প্রকারে? চিরকাল বিরহ-অনলে দগ্ধীভূত হওয়ার চেয়ে অন্য কাহাকেও স্বামিত্বে বরণ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করা ভাল নহে কি?”

দুর্গাবতী বলিলেন, “দেখ সখিগণ! সত্য বটে আমি অন্য কাহাকেও বিবাহ করিতে চাহিলে পিতা উপযুক্ত ধনী, ঐশ্বর্য্যশালী রাজসংসারে আমার বিবাহ দিবেন, কিন্তু তাহাতে আমার ভরণ-পোষণ প্রভৃতি কায়িক সুখ হইলেও মানসিক সুখ হইবে কি? তোমরা ভাবিতেছ, দলপৎ সাহের সহিত কখনই আমার মিলন হইবে না, একথা আমি বিশ্বাস করি না। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি, তিনি যেন আসিয়া আমাকে লইয়া যাইতেছেন। তিনি ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় কি কখনও ক্ষত্রিয় নারীর অকপট প্রেম প্রত্যাখ্যান করিতে পারে? তাহাতে যে তাহাদের কাপুরুষতা প্রকট হয়? তোমরা দেখিও, যে মুহূর্ত্তে দলপৎ সাহ জানিতে পারিবেন যে, আমি তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী, সেই মুহূর্ত্তে শত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি আমাকে স্বরাজ্যে লইয়া যাইবেন। ইহাতে ক্ষত্রিয়ের কোন অখ্যাতি নাই; ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ইহা অপেক্ষা গৌরবের বিষয়ও আর কিছু নাই।”

রাজকুমারী দুর্গাবতীর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইল। দলপতের প্রতি তাঁহার আনুরক্তির কথা অচিরাৎ গড়মণ্ডলে পৌছিল। রাজা

দলপৎ সাহ্ বহুসংখ্যক সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে আসিয়া মহারাজকে পরাজিত করিয়া দুর্গাবতীকে লইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। দুর্গাবতী গড়মণ্ডলের মহিষীর আসনে উপবেশন করিয়া পবিত্র দাম্পত্য সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্গাবতীর ভাগ্যে বেশী দিন স্বামীর সহিত ঘর-সংসার করিবার সৌভাগ্য হইল না। বিবাহের চারি বৎসর পরে একটি শিশু পুত্র রাখিয়া রাণী দুর্গাবতীকে ও লক্ষ লক্ষ প্রজামণ্ডলীকে অতুল শোক-সাগরে ভাসাইয়া রাজা পরলোকে গমন করিলেন। রাণী দুর্গাবতী সেই শিশু পুত্রের অভিভাবিকারূপে গড়-মণ্ডল রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। প্রজারা রাজার মৃত্যুতে পিতৃহারা হইয়াছিল, কিন্তু রাণীর সুশাসনে তাহারা সে শোক ভুলিয়া গেল।

কিন্তু এই সময় আর এক অঘটন ঘটিল। সম্রাট্ আকবর ভারতে একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিবার মানসে নানাদিকে সৈন্যসামন্ত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। গড়মণ্ডলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও ধন-সমৃদ্ধির কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি আসক খাঁয়ের অধীনে একদল সেনানী পাঠাইয়া দিলেন। আসক খাঁ গড়মণ্ডলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এমন নৈসর্গিক শোভা-সম্পদে সম্পদমান রাজ্য তিনি জীবনে কখনও দেখেন নাই; বিশেষতঃ রাজ্যের শাসনকর্ত্রী একজন রমণী বলিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল, বিনা যুদ্ধেই এমন রাজ্য তিনি অধিকার করিতে পারিবেন। কিন্তু আসক খাঁ ভুল বুঝিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন না, রাজপুত-রমণী কাল-ভুজঙ্গিনী স্বদেশের স্বাধীনতার রক্ষার জন্য—আপন ধর্ম্মরক্ষার জন্য তাহারা যেমন জলন্ত হুতাশনে পুড়িয়া মরিতে পারে—তেমনি অসিহস্তে যুদ্ধও করিতে পারে।

আসক খাঁকে গড়মণ্ডল আক্রমণ করিতে দেখিয়া রাণী দুর্গাবতী তাঁহাকে প্রজাপুঞ্জকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "এতদিন যে গড়ের

জলে বাতাসে তোমরা পরিপুষ্ট হইয়াছ, সেই গড়মণ্ডল আজ বিদেশী, আততায়ী কর্ত্তৃক আক্রান্ত। তোমরা কি বিনা যুদ্ধে তোমাদের সাধের গড়মণ্ডলকে শত্রুর হস্তে তুলিয়া দিবে?" প্রজাগণ সকলে সমস্বরে বলিল, "মা! আমরা প্রাণ থাকিতে সোণার গড়মণ্ডলকে বিজাতির হস্তে ছাড়িয়া দিব না। প্রাণ যায় যাউক, তথাপি বিনাযুদ্ধে জননী জন্মভূমির উপর বিদেশীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে দিব না।" প্রজাগণের সোৎসাহ বাক্যে উৎসাহান্বিতা হইয়া রাণী দুর্গাবতী অসি-হস্তে পুত্র বীরনারায়ণকেও যুদ্ধসাজে সজ্জিত করিয়া দিয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। আসক খাঁয়ের সেনার সহিত তাঁহার সৈন্যের তুমুল যুদ্ধ বাঁধিল। আসক্ খাঁ দুই দুইবার পরাজিত হইলেন। এই সময় পর্ব্বতের নির্ঝরিণী প্লাবিত হওয়ায় গড়মণ্ডলের চতুর্দ্দিক জলময় হইয়া উঠিল। কাজেই বিদেশী শত্রুর কামানের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিতে রাণী দুর্গাবতীর সৈন্যগণের পক্ষে কষ্টজনক হইল। রাণী দুর্গাবতী আহতা হইলেন, বীরনারায়ণ নিহত হইলেন। তার পর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জানিয়া রাণী দুর্গাবতী আপন বুকে আপন অসি বসাইয়া দিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার বহু সৈন্য আসক খাঁয়ের হস্তে নিহত হইয়াছিল। রাণীকে আত্মহত্যা করিতে দেখিয়া তাহারাও যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। রাজপুত রমণীরা জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ-ত্যাগ করিল। আসক খাঁ আসিয়া জনশূন্য গড়মণ্ডল অধিকার করিলেন।

কর্ম্মদেবী

মিবারভূমি বীরাঙ্গনার লীলাভূমি। ভারতবর্ষ যে এক সময়ে বীর-নারী-প্রসবিনী ছিলেন তাহা মিবারের ইতিহাস আলোচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্দ্ধর্ষ মহম্মদ ঘোরীর সহিত যুদ্ধে তিরৌরী ক্ষেত্রে যখন পৃথ্বীরাজের সহিত মিবার-রাজ সমর সিংহ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন, তখন সমরসিংহের প্রধানা মহিষী পৃথা চিতানলে দেহ ভস্মীভূত করেন। কিন্তু কর্ম্মদেবী সহমরণ-প্রথার অনুসরণ করেন নাই। কেন না সমর সিংহ যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে কর্ম্মদেবীর অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র কর্ণের হস্তে রাজ্যভার দিয়া যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন। পুত্রের অভিভাবিকা-স্বরূপ কর্ম্মদেবীই মিবাররাজ্য শাসন করিতেছিলেন।

বিজয়ী মহম্মদ ঘোরী দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে যে দেশদ্রোহী কুলাঙ্গার পৃথ্বিরাজ-দমনে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন,সেই কনৌজ অধিপতি জয়চাঁদের দিকে ধাবিত হইলেন। জয়চাঁদ পরাজিত হইলেন। তখন ভারতবাসী প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারিল যে, গৃহবিবাদ আপনা আপনির মধ্যে যতটা হয় হউক, কিন্তু সেজন্য যে বর্ব্বর অপর বিদেশী শক্তিকে আমন্ত্রণ করিয়া আনে তাহার বিনাশ-সাধন সর্ব্বাগ্রে হয়। বিদেশী আততায়ী যত কেন মিত্রতার ভাণ পূর্ব্বে দেখাক না কেন, তাহারা একে একে সকল শত্রুকে পরাভূত করিয়া থাকে। কনৌজরাজ জয়চাঁদকে পরাজিত করিবার পর মহম্মদ ঘোরীর লোলুপ দৃষ্টি মিবাররাজ্যের উপর পতিত হয় এবং সে কুতবুদ্দীনকে মিবার অধিকার জন্য প্রেরণ করেন। মিবারের প্রজাগণ সকলে কর্ম্মদেবীর আহ্বানে সমবেত হয়। কর্ম্মদেবী নিজে যুদ্ধ করিবেন বলিয়া তাহাদিগকে প্রোৎসাহিত করেন এবং নিজে অমিতবিক্রমে

শত্রুব্যূহমধ্যে পতিত হন; সেই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া 'মিবারের রাজপুত বীরগণ সংখ্যায় অল্প হইলেও কুতবের সৈন্যের সহিত তুমুল যুদ্ধ করেন। সেই যুদ্ধে কর্ম্মদেবীর অতুল বল-বিক্রম ও সাহস দেখিয়া পাঠান সৈন্যগণ যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হয়। কর্ম্মদেবীর বীরত্বের নিকট দুর্দ্ধর্ষ পাঠান শক্তি পরাজিত হয় এবং রণে ভঙ্গ দিয়া ও মিবারের জয়াশা পরিত্যাগ করিয়া তাহারা দিল্লীতে ফিরিয়া আসে। সে বার কর্ম্মদেবীর বীরত্বে মিবারের স্বাধীনতা রক্ষিত হইয়াছিল।

রাণী ভবানী

বঙ্গদেশ পুণ্যভূমি। হিন্দুধর্ম্মের জলন্ত মূর্ত্তি এক সময়ে এই বঙ্গদেশেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আতিথেয়তা, দরিদ্রবাৎসল্য, পর-দুঃখকাতরতা, দান, ধ্যান, পূজার্চ্চনা—যাহা কিছু হিন্দুজাতির বৈশিষ্ট্য তাহা এই বঙ্গদেশে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। বেশী দিনের কথা নহে, নবাব সিরাজুদ্দৌলা যখন বাঙ্গালার নবাব এবং স্বজাতি ও স্বদেশ-বাসীর কূট চক্রান্তে যখন পলাশী-প্রাঙ্গণে নামমাত্র যুদ্ধে ইংরাজ এদেশকে চিরকালের মত হস্তগত করিয়া লইয়া মুসলমান রাজ্যের যবনিকাপাত করিয়াছিলেন, তখন রাণী ভবানী ছিলেন বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভূম্যধিকারিণী। রাজসাহী জেলার নাটোর তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি বড় ভূম্যধিকারিণী বলিয়া নহেন, পরন্তু তাঁহার বিপুল জমিদারীর আয় তিনি অকাতরে দীন-দুঃখী, দেবদ্বিজ, অতিথি-অভ্যাগতের সেবায় ব্যয় করিয়া ছিলেন বলিয়া আজিও শুধু বঙ্গদেশ নহে—সুদূর বারাণসী-ধাম পর্য্যন্ত তাঁহার অন্নসত্রে সহস্র সহস্র লোক তাঁহার যশোগান করিতেছে। রাণী ভবানী জমিদারীর আয় ভোগ অপেক্ষা দানে অধিকতর আনন্দ পাইতেন। রাণী ভবানীর শ্বশুর রাজা রামজীবন ও তাঁহার ভ্রাতা রঘুনন্দন প্রকৃত পক্ষে নাটোরের জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা। রঘুনন্দন ও রামজীবন বাল্যকালে পুটিয়ার জমিদার-সরকারে প্রতি-পালিত হন। পুটিয়ার জমিদার দর্পনারায়ণ বাঙ্গালার রাজস্ব-বিভাগের একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন, তিনি রঘুনন্দনের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপনার সহকারী-পদে নিযুক্ত করেন। ক্রমে রঘুনন্দনের সহিত বাঙ্গালার তদানীন্তন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর পরিচয় হয় এবং একদা নবাব মুর্শিদকুলী কোন গুরুতর রাজকার্য্যে রঘুন্দনের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য পান ফলে তিনি রঘুনন্দনের উপর এতদূর

সন্তুষ্ট হন যে, রাজসাহীর জমিদার উদয়নারায়ণ যখন নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হন তখন নবাব রঘুনন্দনকে সেই বিস্তীর্ণ জমিদারী প্রদান করেন। পুঁটিয়ার জমিদারীও উদয়নারায়ণের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। রঘুনন্দন ইহাও পাইয়াছিলেন। তিনি সমস্ত জমিদারীটি গ্রাস না করিয়া লস্করপুর পরগণা তাঁহার পূর্ব্ব মালিক দর্পনারায়ণের পরিবারবর্গকে প্রত্যর্পণ করিলেন এবং আপন ভ্রাতা রামজীবনের নামে পুটিয়ার সমগ্র জমিদারী পত্তন করিয়াছিলেন। শুধু পুটিয়া নহে, ক্রমে ক্রমে রঘুনন্দন রাজসাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর এবং যশোহরের অনেক জমিদারী পাইলেন। দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে নাটোরের জমিদার রঘুনন্দনের জমিদারীর ন্যায় বিস্তীর্ণ জমিদারী আর ছিল না। রঘুনন্দনের জমিদারী হইতে বৎসরে নবাব সরকারে ৫২ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদান করা হইত। রঘুনন্দন এতাদৃশ ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন যে, তিনি স্বোপার্জ্জিত বিস্তীর্ণ জমিদারী আপন ভ্রাতা রামজীবনের নামে পত্তন করিয়া দিয়াছিলেন। নবাব রামজীবনকে "রাজা" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

রঘুনন্দনের সন্তানাদি হয় নাই। রামজীবনের রামকান্ত নামে একটি পোষ্য পুত্র ছিল আর তাহাদের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুরামের দেবীপ্রসাদ নামে একটি পুত্র ছিল। দেবীপ্রসাদ রামকান্তকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করিয়া সমস্ত জমিদারী নিজে ভোগ দখল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ইহা দেখিয়া রামজীবন রামকান্তকেই উইলের দ্বারা সমগ্র জমিদারীর অধিকারী করিয়া গেলেন। রামজীবনের নামেই জমিদারী পত্তন ছিল, সুতরাং এরূপ করিবার তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল।

রাজসাহী জেলার হাতিম গ্রামের ব্রাহ্মণবংশীয় জমিদার আত্মারাম চৌধুরীর কন্যা ভবানীর সহিত দেবীপ্রসাদের বিবাহ হয়। রাম-

জীবনের পরলোক-প্রাপ্তির পর রামকান্ত "রাজা" হইলে ভবানী "রাণী ভবানী" নামে সর্ব্বসাধারণে পরিচিত হন। দীঘাপতিয়া রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারাম নামে একজন বিচক্ষণ লোক রামজীবনকে জমিদারী-পরিচালনায় পরামর্শ প্রদান ও সাহায্য করিতেন। কিন্তু রামকান্ত জমিদারীর মালিক হইয়া দয়ারামকে আদৌ আমল দিতেন না। রামকান্তকে জমিদারীতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে দেখিয়া একদিন দয়ারাম রামকান্তকে একটু মৃদু তিরস্কার করেন। ইহাতে রামকান্ত নিজেকে অপমানিত মনে করিয়া যে দয়ারামকে তাঁহার পিতা-পিতামহ অভিভাবকের ন্যায় মান্য করিতেন সেই দয়ারামকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। দয়ারাম উদ্ধতচরিত্র রামকান্তকে উচিতমত শিক্ষা দিবার জন্য মুর্শিদাবাদে গমন করিলেন। তখন আলিবর্দ্দী খাঁ মুর্শিদাবাদের নবাব। দয়ারামকে আলিবর্দ্দী পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন। রামকান্ত নবাব সরকারে বহুদিন হইতে রাজস্ব বন্ধ করায় নবাব আলিবর্দ্দী পূর্ব্ব হইতেই তৎপ্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার সেই ক্রোধানলে দয়ারাম আরও ইন্ধন জোগাইলেন। তিনি যখন নবাবকে বলিলেন যে, রামকান্তের রাজকোষে বহু অর্থ আছে, তিনি রাজার ন্যায় মহাড়ম্বরে অর্থের যদৃচ্ছা অপব্যয় করিতেছেন, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক নবাব সরকারে রাজস্ব দিতেছেন না, তখন নবাবের আর ক্রোধের সীমা থাকিল না। তিনি রামকান্তের অর্থাদি লুণ্ঠন করিবার জন্য নাটোরে সৈন্য প্রেরণ করিলেন, সৈন্যেরা রামকান্তের প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া যদৃচ্ছা লুণ্ঠন করিতে লাগিল। রামকান্ত দেখিলেন, এরূপ বৃহৎ মোগল সেনাদলের সহিত তাঁহার ন্যায় জমিদারের পক্ষে যুদ্ধ করা বৃথা। তাই তিনি তাঁহার প্রথমা রাণী ভবানীকে লইয়া পলায়ন করিলেন। রাণী ভবানী তখন গর্ভবতী। রামকান্তের যাহা কিছু অর্থ-সম্পদ ছিল, নবাব সৈন্য

তৎসমস্ত লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেল, আর রামকান্তের স্থলে দেবীপ্রসাদ নাটোর রাজ্যের অধিপতি হইলেন। কেহ কেহ বলেন, রামকান্তের রাজ্যভ্রষ্টতার মূলে দয়ারামের কোনই দুরভিসন্ধি ছিল না। দেবী-প্রসাদের দক্ষিণ হস্ত বেণীভূষণই ষড়যন্ত্র করিয়া রামকান্তকে রাজ্যচ্যুত করে এবং বেণীভূষণেরই ষড়যন্ত্রে রামকান্ত নবাব সরকারে যে রাজস্বের টাকা প্রেরণ করিতেছিলেন তাহা লুণ্ঠিত হওয়ায় তিনি রাজ্যচ্যুত হন।

রামকান্ত নাটোর হইতে সস্ত্রীক মুর্শিদাবাদে গিয়া সামান্য একটি বাড়ী ভাড়া লইয়া অতিকষ্টে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে যখন তিনি মুর্শিদাবাদে আসিতেন, তখন নাটোর রাজ-পরিবারের জন্য নির্ম্মিত গঙ্গাতীরবর্ত্তী সুরম্য হর্ম্ম্যে তিনি বাস করিতেন, কিন্তু এখন রাজ্যচ্যুত হওয়ায় তাহা দেবীপ্রসাদের অধিকারে আসিয়াছে।

দয়ারাম রায় নাটোর পরিত্যাগ করা অবধি কখনও মুর্শিদাবাদে আবার কখনও বা দিঘাপতিয়ায় বাস করিতেন। একদিন যে নাটোরে তিনি অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্যশাসন করিয়া আসিয়াছেন, সেই নাটোরে আর কখনও মুখ দেখাইবেন না—ইহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল। একদিন শিবিকারোহণে রামকান্তের বাসার পার্শ্ব দিয়া দয়ারাম নবাব দরবারে যাইতেছিলেন, এমন সময় বাসাবাটীর ছাদ হইতে দয়ারামকে দেখিতে পাইয়া রামকান্ত একেবারে "দাদা, দাদা" বলিয়া তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিলেন। বহুদিনের পর রামকান্তকে পাইয়া দয়ারাম পূর্ব্ব অবমাননা ভুলিয়া গেলেন এবং রামকান্তকে পুনর্ব্বার নাটোরের সিংহাসনে বসাইবেন বলিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন। রাণী ভবানী রাজ্য-পুনঃপ্রাপ্তির ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য দয়ারামের হস্তে তাঁহার যাবতীয় অলঙ্কারপত্র খুলিয়া দিলেন।

এদিকে দেবীপ্রসাদের পাপের ভরা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। দেবী-

প্রসাদ নাটোর-সিংহাসনে উপবেশন করিবার পর হইতে প্রজাগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রজাগণের গৃহ-দাহ হইতে যুবতীহরণ পর্য্যন্ত কোন দুষ্কর্ম্মই তাঁহার বাকি ছিল না। তাঁহার বৈঠকখানা সর্ব্বদা মাতালগণের মাতলামীতে পরিপূর্ণ হইয়া থাকিত। নিজেও মদ খাইয়া এরূপ মাতাল হইয়া পড়িয়া থাকিতেন যে, রাজকার্য্যে আদৌ মনোনিবেশ করিতেন না। ফলে নবাব সরকারে বার্ষিক রাজস্ব বন্ধ হইল, ঘন ঘন তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি নবাব-দরবারে রাজস্ব প্রেরণ করিতে পারিতেন না। ইহার ফলে নবাব আলিবর্দ্দী কুপিত হইয়া একদিন প্রকাশ্য দরবারে নাটোর রাজ্যের ব্যবস্থা করিবার জন্য মন্ত্রিগণের পরামর্শ চাহিলেন। দয়ারাম রায় সেই দরবারে উপস্থিত ছিলেন। সুযোগ বুঝিয়া তিনি রামকান্তকে পুনরায় নাটোরের রাজপদে প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব করিলেন। নবাব আলিবর্দ্দী দয়ারামের প্রস্তাবানুসারে রামকান্তকে নাটোররাজ্য পুনরায় প্রত্যর্পণ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। অচিরাৎ নবাবের সৈন্যদল নাটোরে আসিয়া দেবীপ্রসাদের ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিল এবং সস্ত্রীক রামকান্তকে নাটোর রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করিল।

রামকান্তের পুনরাগমনে নাটোর রাজ্যের প্রজামণ্ডলীর মধ্যে আবার তুমুল আনন্দের কোলাহল উঠিল। রাণী ভবানীর মাতুল-পুত্র চন্দ্রনাথ ঠাকুর এবার দয়ারামের পরামর্শানুসারে জমিদারী পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তখন যে রামরূপকে রামকান্ত একদিন সদর হইতে দূরীভূত করিয়া দিয়াছিলেন সেই রামরূপ এখন রামকান্তের দক্ষিণ হস্ত হইল। রাজা রামকান্ত রাজ্যাভিষেক উৎসব উপলক্ষে রাণী ভবানীর সঞ্চিত অর্থের অর্দ্ধেক নজরানা-স্বরূপ নবাব দরবারে প্রেরণ করিলেন, অবশিষ্ট টাকায় দেবীপ্রসাদ আগুন জ্বালাইয়া প্রজাদের যে সকল ঘরবাড়ী ভস্মী-ভূত করিয়াছিল সেগুলি নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন, যাহারা খাজনার টাকা

পরিশোধ করিতে না পারায় দেশত্যাগী হইয়াছিল, তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনা হইল। প্রজাবর্গের খাজনা মকুব• করিয়া তাহাদিগকে চাষাবাদের জন্য অর্থ যাহায্য করা হইল। আর পরমশত্রু দেবী প্রসাদকে নাটোর হইতে দূরীভূত না করিয়া তাঁহাকে নাটোরেই স্বতন্ত্র বাড়ীতে রাখা হইল। এমন কি যে বেণীভূষণ মৈত্রের ষড়যন্ত্রে রামকান্তকে রাজ্যচ্যুত হইয়া অমানুষিক কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল, সেই বেণীমাধবের সহিত রামকান্ত স্বয়ং সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার স্ত্রী ও কন্যার ভরণ পোষণের পর্য্যন্ত ভার লইলেন। রাজা রামকান্তের অভিষেক উৎসবে নবদ্বীপ, মিথিলা, কাশী, কাঞ্চি, দ্রাবিড় প্রভৃতি স্থান হইতে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। তাহাতে বঙ্গদেশের যাবতীয় রাজা মহারাজা হইতে স্বজাতিয় বারেন্দ্র শ্রেণীর কত কুলীন যে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। দেবীপ্রসাদ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর কাড়িয়া লইয়াছিলেন, রাজা রামকান্ত সে সমস্ত প্রত্যর্পণ করিলেন, ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে দু'হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্ব ও পরে কাতারে কাতারে কাঙ্গালীগণ উদর পূর্ণ করিয়া খাইয়া ছিল।

রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির পর হইতে ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দ বা ১১৪৩—৪ পর্য্যন্ত রাজা রাজা রামকান্ত রায় বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে রাজ্যশাসন ও অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়াছিলেন। কোনরূপ দুঃখ ও বিষাদের ছায়া এক দিনের জন্যও তাঁহাদের দাম্পত্য জীবনের অনাবিল শান্তি নষ্ট করে নাই। যথাসময়ে তাঁহাদের একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করে; কিন্তু পুত্রটি জন্মগ্রহণের দুই বৎসর পরে অকস্মাৎ একদিনের জ্বরে পিতা মাতাকে চির শোক সাগরে ভাসাইয়া চলিয়া যায়। ইহার কিছুদিন পরে রাজা রামকান্তও নাটোর রাজ্যের

প্রজাবর্গকে দুঃখ-সাগরে ভাসাইয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। পতি-শোক-বিদগ্ধা রাণী ভবানী তৎকালীন দেশ-প্রথানুসারে পতির সহিত সহমরণে যাইবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজা রামকান্ত তাঁহাকে অন্তিমকালে অনুরোধ করিয়া যান, যেন তিনি সহমরণে না যাইয়া "পোষ্যপুত্র" গ্রহণ করেন এবং অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজা-পালন করিতে থাকেন। রাজা রামকান্তের শ্রাদ্ধোপলক্ষে রাণী ভবানী বাঙ্গালায় ভীষণ জলকষ্ট দর্শন করিয়া বহুসংখ্যক দীঘিকা ও পুষ্করিণী খনন করিয়া দিয়াছিলেন। উত্তর বঙ্গের যাবতীয় দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী যে রাণী ভবানীর অতুল পরদুঃখকাতরতার নিদর্শন, এ কথা বলাই বাহুল্য। সে সময়ে উত্তরে বঙ্গে ভবদা-ভবানীপুরে মা-ভবানীর পীঠস্থান ছিল। বহু লোক সেই পীঠস্থানে পূজা দিতে যাইত; কিন্তু দুর্গম, জঙ্গলাবৃত রাস্তা দিয়া যাইতে হইত বলিয়া ধর্ম্মপিপাসু লোকদের যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইত। রাণী ভবানী পথিকদিগের কষ্ট দূর করিবার নিমিত্ত যেখানে জলাভূমি আছে, সেখানে ইষ্টকনির্ম্মিত সেতু প্রস্তুত করিয়া দিলেন; যেখানে জলকষ্ট আছে, সেখানে সোপানাবলী-বিশিষ্ট পুষ্করিণী নির্ম্মাণ করিয়া করিয়া দিলেন; পথিকদের জন্য স্থানে স্থানে পান্থশালা ও শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলেন, তাহা ছাড়া পনর হাত বিস্তৃত পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়া তাহার উভয় পার্শ্বে নৌকা চলা-চলের উপযোগী খাল কাটাইয়া দিলেন।

ইহা ছাড়া কাশীধামে দুর্গাবাড়ী প্রতিষ্ঠা করিলেন, কাশীর সীমানা নির্দ্দেশ করিবার জন্য প্রতি স্থানে শিবস্থাপনা করিলেন, তথায় নীল ভৈরব শিবপ্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহা ছাড়া অন্নসত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া সহস্র সহস্র লোকের অন্নসংস্থানের উপায় করিয়া দিলেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি ব্রহ্মচারিণী হইয়া মুর্শিদাবাদের উত্তরে বড় নদীর তীরে তাঁহাদের যে বাসভবন ছিল তাহাতে বাস করিতেন।

তবে মধ্যে মধ্যে কন্যা তারাসুন্দরীকে দেখিবার মানসে তিনি নাটোরে যাইতেন। রাজা রামকান্তের মৃত্যুর এক বৎসর পরে রাণী ভবানী খাজুরা গ্রামের রঘুনন্দন লাহিড়ীর সহিত তারাসুন্দরীর শুভ বিবাহ দেন; কিন্তু বিবাহের এক বৎসর পরেই কুসুম-কোমল বালিকা তারা-সুন্দরী বিধবা হন। তদবধি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া মাতা ও কন্যা গঙ্গাতীরে বাস করিতেন।

রাজ্য-শাসনের কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া এবং পতির অন্তিম আদেশ স্মরণ করিয়া রাণী ভবানী রাজসাহী জেলার আমরুল পরগণার আট গ্রামের রায় বংশের রামকৃষ্ণ রায়কে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিলেন। কথিত আছে, পোষ্য-গ্রহণ-সভায় অনেক পালক উপস্থিত হইয়াছিল, সকলেই সভামধ্যে আসিয়া অধোবদনে আপনাপন আসনে উপবেশন করে। যখন বালক রামকৃষ্ণের বসিবার সময় আসিল, তখন রামকৃষ্ণ আসিয়া না বসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে দয়ারাম বলিলেন, "বালক তুমি দাঁড়াইয়া কেন?" বালক উত্তর করিল, "আমার জুতা খুলিয়া দেয় কে?" দয়ারাম তখন স্বহস্তে জুতা খুলিয়া দিলেন এবং এই বালকের তেজস্বিতা ও আত্মসম্মানজ্ঞান-দর্শনে মোহিত হইয়া রাণী ভবানী ও দয়ারাম উভয়েই ইঁহাকে নাটোর রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারি-পদে বরণ করিলেন। বস্তুতঃ নাটোর রাজবংশের সহিত রামকৃষ্ণের বংশেরও সৌসাদৃশ্য ছিল। যে জীব ওঝা (মৈত্র) হইতে উৎপন্ন কামদেবের বংশ নাটোর-রাজ্যের আদিপুরুষ, সেই কামদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অভিরামের বংশ হইতেই রামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণের পিতার নাম ছিল—হরিদেব রায়। পোষ্যপুত্র গ্রহণের পর হইতে রাণী ভবানী নাটোর একরূপ পরিত্যাগ করেন, অধিকাংশ সময় তিনি হয় মুর্শিদাবাদ বড়নগরে, না হয় কাশীধামে অবস্থিতি করিতেন।

এস্থলে একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। উচ্ছৃঙ্খল যুবক সিরাজদ্দৌলা তখন মুর্শিদাবাদে নবাব। তাঁহার অত্যাচারের সীমা এতদূর চরমে গিয়া পৌঁছিয়াছে যে, রাজা হইতে প্রজা পর্য্যন্ত সকলের তাহা অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। জগৎ শেঠের বাড়ীতে সকলে পরামর্শ করিবার জন্য বসিলেন। সেই পরামর্শ-সভায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, সেনাপতি মোহনলাল, রাজা নন্দকুমার, রাজা রাজবল্লভ, সেনাপতি দুর্ল্লভরাম, সেনাপতি মীরজাফর সকলেই আসিয়াছেন, চিকের আড়ালে বসিয়া রাণী ভবানীও পরামর্শ-সভার আলোচনা শুনিতেছেন। জগৎ শেঠ বলিলেন, নবাব সিরাজদ্দৌলা যেরূপ কুলবধূর উপর পর্য্যন্ত পাশবিক অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালার মসনদে আর তাঁহাকে রাখা নিরাপদ নহে। মোহনলাল ছাড়া আর কেহ সে কথার প্রতিবাদ করিলেন না। মোহনলাল সিরাজের পক্ষ টানিয়া কিছু বলিয়া সভাক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। মীরজাফর বলিলেন, ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছে, তাহাতে তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, ইংরাজেরা সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াই অন্য ভাল লোককে নবাবী দিবে এবং রাজ্যে তাহাদের কোনই আসক্তি নাই। অতএব ইংরাজ বণিকের সহায়তায় সিরাজকে দূর করাই কর্ত্তব্য। সভাস্থ সকলে মীরজাফরের কথার সমর্থন করিলেন। রাজা জগৎ শেঠ রাণী ভবানীর অভিমত জানিতে চাহিলে তিনি চিকের আড়াল হইতে বলিলেন, "সিরাজ অত্যাচারী বটে, কিন্তু সে অত্যাচার দমন করিবার জন্য নিজেদেরই চেষ্টান্বিত হওয়া কর্ত্তব্য। এজন্য ইংরেজ বণিকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত নহে। পরনির্ভরতা এরূপ ক্ষেত্রে সর্ব্বথা পরিত্যজ্য।

কিন্তু নবাবীর আশায় উন্মত্ত মীরজাফর রাণী ভবানীর এই সদুক্তি শুনিলেন না, তাঁহার প্ররোচনায় "স্ত্রীলোকের পরামর্শ" বলিয়া রাণী ভবানীর পরামর্শ অগ্রাহ্য হইল; সকলেই মীরজাফরের পরামর্শ গ্রহণ

করিলেন; তাহার ফলে পলাশীর আম্রকাননে নামমাত্র যুদ্ধ করিয়া ক্লাইব বাঙ্গালাদেশ অধিকার করিলেন। সে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুনের কথা। ঐদিন সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার ভাগ্যরবি অস্তমিত হইল। সিরাজ প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন, কিন্তু রাজ-মহলে গিয়া যখন ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া এক দরবেশের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, তখন বিশ্বাসঘাতক দরবেশ গিয়া চুপি চুপি পরপারে মীরজাফরের পুত্র মীরণকে সংবাদ দিল। মীরণ আসিয়া সস্ত্রীক সিরাজদ্দৌল্লাকে বন্দী করিল। অতঃপর সিরাজদ্দৌল্লাকে মুর্শিদাবাদে আনিয়া মহম্মদীবেগ নামক এক নিষ্ঠুরের সাহায্যে কুঠারাঘাতে মীরজাফরের পুত্র মীরণ সিরাজের দেহ খণ্ডবিখণ্ড করিলেন। সিরাজ মৃত্যুকালে কত প্রকারে কাকুতি-মিনতি করিয়া মহম্মদী বেগের নিকট প্রাণভিক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু মহম্মদী বেগের পাষাণ-প্রাণে তাহাতে একটুও বিচলিত অথবা বিগলিত হয় নাই। ২৯শে জুন প্রভাতে সাতশত সৈন্যমাত্র সঙ্গে লইয়া ক্লাইব মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিয়া নগর অধিকার করিলেন।

এইভাবে মুর্শিদাবাদের গৌরব-সূর্য্য অস্তমিত হইলে বাঙ্গালায় ভবিষ্যতে বিদেশীর শাসন চলিবে, ইহা দূর-দৃষ্টিতে বুঝিতে পারিয়া রাণী ভবানী বৃদ্ধ চন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ও তারাসুন্দরীকে সঙ্গে লইয়া কাশীধামে গমন করিলেন। তথায় যাইয়া কাশীর সীমানায় সীমানায় শিবলিঙ্গ স্থাপন করিলেন, আর তিনশত পঁয়ষট্টিখানি বাড়ী প্রস্তুত করিলেন। তৎপর মাঘী পূর্ণিমার দিন হইতে প্রত্যহ এক এক-খানি বাড়ী উৎসর্গ করিয়া এক একজন ব্রাহ্মণকে দান করিতে লাগিলেন। ইহা ছাড়া তিনি তিন শতাধিক দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। প্রতিদিন একটি চৌবাচ্ছায় আট মণ করিয়া ছোলা ভিজাইয়া তাহা ভিখারীদিগকে দান করা হইতে লাগিল। আজিও

কাশীধামে মহারাণী ভবানীর অন্নসত্র অব্যাহতভাবে চলিতেছে। কাশীর সীমানায় তিনি যেমন এক একটি শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তেমনি সেই সেইস্থানে এক একটি বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার পার্শ্বে কূপ খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। যাহাতে পথশ্রান্ত পথিক সেই স্থানে বিশ্রাম করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে প্রতি বৃক্ষের নিকট এক একটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। শুধু কাশীধামে নহে, বঙ্গদেশেও যে তিনি কত ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার আর তুলনা নাই।

বিধবাদিগের জন্যও তিনি গঙ্গাতীরে এবং কাশীধামে বহু আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

ইহার পর রাণী ভবানীকে আর এক কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। সেই পরীক্ষায় তাঁহার প্রাণ দীনদুঃখী আর্ত্তের জন্য যে কিরূপ কাঁদিত তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পলাশীর যুদ্ধের পর ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" দিল্লীর নামমাত্র সম্রাট্ সাহ আলমের নিকট হইতে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সনন্দ লাভ করেন। সম্রাট্‌কে বার্ষিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা রাজকর প্রদান করিয়া কোম্পানী দেশের রাজস্ব সংগ্রহ করিবেন, ইহাই স্থির হয়। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব বাঙ্গালার গবর্ণর হইয়া আসেন, তদবধি বাঙ্গালায় সত্য সত্যই কোম্পানীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হয়। পলাশীর যুদ্ধের পর প্রথম তিন বৎসরের মধ্যে মীরজাফর সিংহাসনচ্যুত হন, মীরকাশিম নবাবী প্রাপ্ত হন। আবার পরবর্ত্তী তিন বৎসরের মধ্যে মীরকাশিম সিংহাসনচ্যুত হইয়া অতি কষ্টে দীন ভিখারীর ন্যায় কালাতিপাত করিবার পর মৃত্যুমুখে পড়িয়া সকল জ্বালা হইতে অব্যাহতি পান। তৎপর মীরজাফর আবার দুই বৎসরের জন্য নবাবী পান এবং সেই দুই বৎসর মাত্র রাজ্য ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরিশেষে ১৭৬৫

খৃষ্টাব্দে কোম্পানী দেওয়ানী সনন্দ লাভ করিলে মীরজাফরের পুত্র নামে মাত্র নবাব হন।

১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে (১১৭৪ সালে) বঙ্গদেশে অজন্মা হওয়ায় এরূপ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় যে, দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্টদের মর্ম্মভেদী কাহিনী শুনিয়া কাশীধাম হইতে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণারূপিণী জননী ভবানী নাটোরে আসিয়া উপস্থিত হন। আসিয়া দেখেন, প্রজাগণ অন্নাভাবে মাঠের তৃণ ভক্ষণ আরম্ভ করিয়াছে কিন্তু তাহাও জুটিতেছে না। পথে ঘাটে মানবের মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। প্রজা ও দেশবাসীর এই প্রকার দারুণ দুরবস্থা দর্শনে ব্যথিতা হইয়া দয়াময়ী রাণী ভবানী কর্ম্মচারীদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "খাজনার জন্য কোন প্রজাকে কখনও পীড়ন করিবে না, প্রতি গ্রামে গ্রামে কেন্দ্র খুলিয়া অকাতরে দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্টদের মধ্যে অন্ন বিতরণ কর।" বহু রাজবৈদ্য নিযুক্ত করিয়া গ্রামে গ্রামে তাহাদিগকে চিকিৎসার জন্য পাঠাইলেন। রাণী ভবানী রাজকোষ মুক্ত করিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া সেই দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুধিতকে অন্নদান করিয়াছিলেন। ১১৭৬ সালে এই দুর্ভিক্ষ প্রবল আকার ধারণ করে বলিয়া আজিও এই মন্বন্তরকে "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" বলিয়া থাকে। রাণী ভবানী এই মন্বন্তর-দমনে নিজের রাজকোষ শূন্য করিলেও মন্বন্তর এরূপ প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে উপস্থিত হইয়াছিল যে, বাঙ্গালার এক তৃতীয়াংশ লোক সেই সময় অন্নাভাবে মারা গিয়াছিল। মন্বন্তরের পর দেশে কয়েক বৎসর প্রচুর শস্য হইয়াছিল।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ ভারতের গবর্ণর-জেনারেল হইয়া আসেন। প্রথম বয়সে তিনি কাশিমবাজারের কুঠীতে সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি রাজস্ব আদায়ের জন্য "সার্কিট কমিটি" নামে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটি রাণী ভবানীর রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করেন, তাহার ফলে রাণী ভবানী

সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক বাহিরবন্দ পরগণার স্বত্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। হেষ্টিংস্ তাঁহার হাত হইতে উহা কাড়িয়া লইলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার দান-ধ্যান যথারীতি চলিয়াছিল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর তিনি আরও ৩৩ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাহার পর ১২১০ সালের (১৮০৩ খৃষ্টাব্দের) মাঘী পূর্ণিমার দিন তিনি সজ্ঞানে সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেন। তিনি ৭৯ বৎসর জীবিতা ছিলেন। তাঁহার এই ৭৯ বৎসরের জীবনই আলোচনার যোগ্য। তাঁহার বাটীতে যেরূপ দুর্গোৎসব হইত, সেরূপ দুর্গোৎসব বঙ্গে কখনও হয় নাই, বোধ হয় হইবেও না। প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের সময় মহারাণী স্বহস্তে দুই সহস্র সধবাকে পট্টবস্ত্র, শাঁখা ও সোণার নথ পরাইয়া দিতেন। দেবী পক্ষের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রতিদিন তিনি এক শতের উপর কুমারীকে নব নব বস্ত্র ও অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া পূজা করিতেন। ইহা ছাড়া সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে তিনি যে কত টাকা দান ও বৃত্তি প্রদান করিতেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। বঙ্গের দূর-দূরান্তরে থাকিয়াও বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহার প্রদত্ত বৃত্তি ভোগ করিতেন। রাণীর কাশীধামস্থ অন্নসত্রে প্রতিদিন ১০৮ জন সধবা ও ১০৮ জন কুমারী-ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। রাণীর ন্যায় তারাসুন্দরীও দেবদ্বিজে অনুরূপ ভক্তিমতী ছিলেন।

রাণী ভবানীর পোষ্য পুত্র রাজা রামকৃষ্ণ একজন সাধক ছিলেন, রাজকার্য্যে তিনি আদৌ মনোনিবেশ করিতেন না। ফলে দিন দিন করিয়া এক একটি তালুক বিক্রীত হইতে থাকে। রাজা রামকৃষ্ণ তাহা শুনিয়া দুঃখিত না হইয়া বরং আনন্দে জয়কালীর বাটীতে যাইয়া বলিতেন, "মা আজ আমার একটি বন্ধন খসিয়া গেল।" তাঁহার দুইটি পুত্র সন্তান হইয়াছিল (১) বিশ্বনাথ (২) শিবনাথ। বিশ্বনাথ ও শিবনাথ হইতেই নাটোরের বড় তরফ ও ছোট তরফের সৃষ্টি হয়।

ইঁহাদের কাহারই কোন পুত্রসন্তান হয় নাই। তাঁহারা দুইজনেই দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্বনাথের পোষ্য পুত্র গোবিন্দচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র গোবিন্দনাথকে পোষ্য গ্রহণ করেন। গোবিন্দনাথেরও কোন পুত্রসন্তান হয় নাই। গোবিন্দনাথ জগদিন্দ্রনাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। জগদিন্দ্রনাথই বড় তরফের কর্ত্তা ছিলেন। ছোট তরফের শিবনাথ আনন্দনাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। আনন্দনাথের পুত্র যোগেন্দ্রনাথ। রাণী ভবানীর কন্যা তারাসুন্দরীর নামে যেসমস্ত বড় বড় তালুক ছিল, সে সব তিনি বিশ্বনাথকে দান করেন। সেই সমস্ত তালুক হইতে নাটোরের বড় তরফের সৃষ্টি হয়। শিবনাথের অধিকৃত দেবোত্তর সম্পত্তি হইতে ছোট তরফের সৃষ্টি হইয়াছে।

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় সাহিত্যসেবী ছিলেন। তিনি "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার প্রণীত "নূরজাহান" "স্মৃতি-কথা" ও "সন্ধ্যা-তারা" বাঙ্গালা ভাষার অমূল্য সম্পদ্। তাঁহার পুত্র মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া উক্ত পত্রের সম্পাদকতা করিতেছেন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য।

লক্ষ্মীবাই

ভারতবর্ষের মধ্যস্থলে বুন্দেলখণ্ডের নিকট ঝাঁসি নামক একটি ক্ষুদ্র রাজ্য দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর-দক্ষিণে সমুন্নত পর্ব্বতমালা পরিবেষ্টিত বলিয়া ঝাঁসি প্রাকৃতিক শোভায় অতীব রমণীয়। এই ক্ষুদ্র রাজ্যের পরিমাণ ১৫৬৭ বর্গ মাইল ছিল। পূর্ব্বে ঝাঁসি মহারাষ্ট্রবীর পেশবার পরিচালিত মহারাষ্ট্রবংশীয়দের শাসনাধীন ছিল। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাধর রাও ঝাঁসির সিংহাসনে আরোহণ করেন; লক্ষ্মীবাই এই গঙ্গাধর রাওয়েরই সহধর্ম্মিণী। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাধর রাও মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি আনন্দ রাও নামক একটি পঞ্চম-বর্ষীয় আত্মীয়-পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করেন। ইহার পূর্ব্ব হইতেই ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ঝাঁসি রাজ্যের উপর আপনাদের প্রভুত্ব চালাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কাজেই তিনি যে মুহূর্ত্তে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন, সেই মুহূর্ত্তে ইংরাজ গবর্ণর-জেনারল লর্ড ডালহৌসী ঝাঁসি ব্রিটিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন।

কিন্তু তেজস্বিনী লক্ষ্মীবাই ডালহৌসীর এই প্রকার অন্যায় বিচারে আত্মসমর্পণ করিলেন না। তিনি লর্ড ডালহৌসীকে বলিলেন, তাঁহার স্বামী রাজ্যের চিরপ্রথানুসারে দত্তক গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, সেই দত্তককে যদি রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করা না হয়, তাহা হইলে তিনি বিনা যুদ্ধে ঝাঁসির এক কণা মৃত্তিকাও ব্রিটিশ রাজ্যের সহিত সংযোজিত হইতে দিবেন না। ব্রিটিশ এজেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি বলিলেন, "আমি প্রাণ দিব, তথাপি আমার ঝাঁসি দিব না।" লক্ষ্মীবাই কবে ব্রিটিশ রাহুর কবল হইতে

তাঁহার প্রাণের ঝাঁসিকে নির্ম্মুক্ত করিতে পারিবেন, সেই, সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ একদিন সে সুযোগও প্রদান করিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের অনল করাল বদন বিস্তার করিয়া ব্রিটিশ শক্তিকে গ্রাস করিবার জন্য সমুৎসুক হইল। সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নির লহ-লহ জিহ্বা বঙ্গদেশ হইতে সুদূর বুন্দেলখণ্ডে পর্য্যন্ত প্রসারিত হইল। লক্ষ্মীবাই এবার সুযোগ বুঝিয়া ব্রিটিশ শক্তিকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য নিজে রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে অবতীর্ণা হইলেন। যে নারী এতদিন অন্তঃপুরের মধ্যে কুসুমকোমলা কমনীয়া বলিয়া অবস্থিতা ছিলেন, আজ সেই নারী কর্ত্তব্যের কঠোর আহ্বানে বজ্র হইতেও কঠোরতর হইয়া প্রকাণ্ড রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ব্রিটিশ সেনাপতি স্যার হিউ রোজ বহু সৈন্য-সামন্ত, অশ্বারোহী, পদাতিক প্রভৃতি লইয়া লক্ষ্মীবাইয়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; কিন্তু দাঁড়াইলে কি হয়? এই বীর রমণীর শক্তির নিকট কয়েক মাস যাবৎ তাঁহাদিগকে স্তম্ভিত হইয়া থাকিতে হইয়াছিল তার পর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুন, গোয়ালিয়রের নিকট ইংরাজ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া লক্ষ্মীবাই ও তাঁহার ভগিনী যখন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন অকস্মাৎ ব্রিটিশ সৈন্য পশ্চাৎদিক হইতে যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্যে গুলি ছুঁড়ে, ফলে তাঁহাদের জীবনলীলার অবসান হয়। তাঁহার সৈন্যগণ চিতানলে তাঁহার ও তাঁহার ভগিনার দেহ ভস্মীভূত করে।

রাণী লক্ষ্মীবাই যে শুধু একজন বীর রমণী ছিলেন, তাহা নহে। তিনি ধার্ম্মিকা এবং রাজনীতিকুশলাও ছিলেন। তাঁহার স্বামীর যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার বয়স দ্বাবিংশতি কি ত্রয়োবিংশতি। এই বয়সেই তিনি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ব্রিটীশ রাজের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া

ঝাঁসি রাজ্য শাসন করিতেন। তিনি প্রতিদিন শেষ রাত্রিতে উঠিয়া ৪।৫ দণ্ড বেলা পর্য্যন্ত শিবপূজা করিতেন। তার পর অশ্বারোহিণীর পোষাক পরিয়া রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে অশ্বচালনা করিয়া বেড়াইতেন। তৎপর পুনরায় স্নান করিয়া ব্রাহ্মণ ও দীন-দুঃখীদিগকে দান করিয়া আহার করিতেন। অতঃপর বেলা তিনটা পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজের টুকরায় রামনাম লিখিতেন। সেই কাগজের টুকরাগুলি ময়দায় আচ্ছাদিত করিয়া মৎস্য-কুলের আহারের নিমিত্ত জলে ফেলিয়া দিতেন। ৩টার পর তিনি দরবার-কক্ষে যাইয়া রাজকার্য্য সমাধা করিতেন। তিনি দরবার-কক্ষে পর্দ্দার অন্তরালে বসিয়া স্বকর্ণে প্রজাদের আবেদন, নিবেদন ও অভিযোগ শুনিতেন। তিনি এইভাবে মাত্র ৮।১০ মাস রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।

ইংরেজ সৈন্যগণ ঝাঁসি অধিকার করিয়া লুণ্ঠন ও হত্যার তরঙ্গে সমগ্র ঝাঁসি তরঙ্গায়িত করিয়াছিল। তাঁহার পুত্রকে মাত্র মাসিক দুইশত টাকা বৃত্তি দিয়া ইন্দোরে রাখা হইয়াছিল। প্রবলপ্রতাপ ইংরেজের হস্তে রাণী লক্ষ্মীবাই পরাজিত হইলেও তাঁহার বীরত্ব চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

সংযুক্তা

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গজনীর রাজা সুলতান মামুদ দ্বাদশবার ভারতাক্রমণ করিয়া অনেক গ্রাম ও নগর লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান ; কিন্তু পঞ্চনদ প্রদেশ ব্যতীত অন্য কোন দেশ তিনি জয় করিতে পারেন নাই। তার পর খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সাহাবুদ্দীন মহম্মদ ঘোরী ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তখন রাজা অনঙ্গ পাল দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার কোন পুত্রসন্তান না হওয়ায় তিনি মৃত্যুকালে পৃথ্বীরাজকে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া যান। ইহাতে কনৌজের রাজা জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজের উপর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন এবং কি প্রকারে পৃথ্বীরাজকে দমন করিবেন, এই চিন্তা করিতে থাকেন। সংযুক্তা এই জয়চাঁদেরই দুহিতা।

জয়চাঁদ নিজেকে ভারতের "সার্ব্বভৌম" সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য এক রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করেন। পৃথ্বীরাজ ও সমর সিংহ ব্যতীত অন্যসকল দেশীয় নৃপতিকেই সেই যজ্ঞে আমন্ত্রণ করা হয়। অধিকন্তু ইঁহাদেরই দুই জনকে অবমানিত করিবার জন্য ইঁহাদের দুইটি প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া যজ্ঞ-সভার দ্বারে স্থাপন করা হইল ; যজ্ঞান্তে সংযুক্তা স্বয়ংবরা হইবে স্থির হইল। সংযুক্তা বীর রমণী, তাই ইতিপূর্ব্বে বীর পৃথ্বীরাজকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। এখন মাল্যদানের সময় উপস্থিত হওয়ায় তিনি সমাগত রাজন্যগণকে উপেক্ষা করিয়া দ্বারদেশে গিয়া পৃথ্বীরাজের প্রতিমূর্ত্তির গলে মাল্য প্রদান করিলেন। জয়চাঁদ এই ঘটনায় সংযুক্তার

প্রতি যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইলেন। সংযুক্তা জীবন্মৃতার ন্যায় পিতৃ-গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে এই সংবাদ পৃথ্বীরাজের কর্ণগোচর হইবা মাত্র পৃথ্বীরাজ মহাবিক্রমে জয়চাঁদের রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং প্রকাশ্য যুদ্ধে জয়চাঁদকে পরাজিত করিয়া সংযুক্তাকে লইয়া স্বরাজ্যে চলিয়া গেলেন।

ইহাতে জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজকে দমন করিবার নিমিত্ত নানা উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, অবশেষে মহম্মদ ঘোরীকে ডাকিয়া আনিয়া পৃথ্বীরাজ-দমনে প্রবৃত্ত হইলেন। চিতোরের রাণা সমরসিংহ পৃথ্বীরাজের সহায়তার জন্য আসিলেন, উভয় বীরের বীরত্বে সেবার মহম্মদ ঘোরী পরাজয়ের কলঙ্কটীকা ললাটে ধারণ করিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন।

পরবর্ত্তী বৎসর মহম্মদ ঘোরী পুনরায় অধিকতর সৈন্য লইয়া পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করিলেন, এবং দৃশদ্বতী নদীতীরে তিরৌরীতে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। সংযুক্তা স্বহস্তে স্বামীকে যোদ্ধবেশ পরাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্যপ্রযুক্ত এবারকার যুদ্ধে সমরসিংহ নিহত ও পৃথ্বীরাজ বন্দী হন। মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজকে অতি নৃশংসভাবে হত্যা করে। যে কয়েক দিন পৃথ্বীরাজ যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দীভাবে ছিলেন, সে কয়েকদিন সংযুক্তা শুধু জল পান করিয়া কাটাইয়াছিলেন। তার পর স্বামী নিহত হইলে নিজে চিতানলে প্রাণ-ত্যাগ করেন।

দাহির-মহিষী

পূর্ব্বে আরবাদি দেশ হইতে জলপথে ভারতবর্ষে প্রবেশের দ্বার ছিল সিন্ধুদেশ। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মহম্মদ বিন্ কাশিম সর্ব্বপ্রথম সিন্ধুদেশ আক্রমণ করেন। সিন্ধুরাজ দাহির কাপুরুষ ছিলেন না, তিনি অমিত তেজ ও বিশ্বস্ত সৈনিকগণকে লইয়া আক্রমণকারী বিন্ কাশিমের সম্মুখীন হইলেন। কিন্তু আপন হস্তীটির জন্য তাঁহাকে যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ফিরিতে হইল। দাহির যে হস্তীর উপর আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই হস্তীটি মুসলমানের অস্ত্রে আহত হইয়া একেবারে দাহিরকে লইয়া একটি নদীর মধ্যে উপস্থিত হইল। ইহা দেখিয়া দাহিরের যাবতীয় সৈন্য প্রভুর পশ্চাদনুসরণ করিল। দাহির যদিও নিজে আহত হইয়াছিলেন, তথাপি পরাজয়ের কলঙ্ক-আশঙ্কায় সে কথা ভুলিয়া গেলেন এবং নদীমধ্য হইতে হস্তিপৃষ্ঠ ত্যাগ করিয়া একটি দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করতঃ আপন বিশৃঙ্খল সৈন্যগণ মধ্য আসিয়া তাহাদিগকে পরিচালনা করিতে লাগিলেন; আবার প্রতি-পক্ষের সহিত দাহিরের প্রবল যুদ্ধ বাধিল। কিন্তু ইতিমধ্যে বিন কাশিমের সৈন্য-সামন্ত অনেক দূর অগ্রসর হওয়ায় দাহিরের সৈন্যগণ আর তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিল না। দাহির চতুর্দ্দিকে শত্রুসৈন্য-পরিবেষ্টিত হইলেন। আসন্ন মৃত্যু সন্নিকট জানিয়াও তিনি কেবল ক্ষত্রিয়ের গৌরব অক্ষুন্ন রাখিবার সেই শত্রুব্যূহের মধ্যে খরশাণ অসিচালনা করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন। অচিরাৎ শত্রুর অসির আঘাতে জর্জ্জরিত-কলেবর হইয়া দাহির ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলেন। দাহিরের মৃতদেহ রণস্থলে পড়িয়া রহিল বটে, কিন্তু

সিন্ধুপতি যে বিনা যুদ্ধে আপন রাজ্য বিদেশীর করে অর্পণ করিয়া দৌর্ব্বল্যের পরিচয় দেন নাই, এই গৌরবময়ী বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইতে লাগিল।

দুঃখের বিষয়, দাহিরের ভীত পুত্র রাজধানী আলোর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র পলায়ন করিলেন। এ সংবাদ দাহির-মহিষীর কর্ণে পৌছিবামাত্র তিনি নিদারুণ পতি-শোক বিস্মৃত হইলেন, কাপুরুষ পুত্রের কথাও ভুলিয়া গেলেন, নিজে রণরঙ্গিণী বেশে আলোর রাজপথ আলোকিত করিয়া বহির্গত হইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার সৈন্য-সামন্তগণ তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইল। দাহির-পত্নীর সেই প্রলয়ঙ্করী, ভীমা, ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি-দর্শনে মহম্মদ বিন্ কাশিমও ক্ষণকালের জন্য বিস্মিত স্তম্ভিত এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল; কিন্তু পরক্ষণেই তাহারা প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। দাহির-মহিষীর সৈন্যগণ জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল; কিন্তু অবশেষে ভারতের সৌভাগ্য-রবি অস্তমিত হওয়ায় সিন্ধুবীরগণ একে একে ধরাশয্যা গ্রহণ করিল। দাহির-পত্নী তখন পুর-মহিলাদের লইয়া উন্মুক্ত কৃপাণহস্তে পুরী রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন ক্রমে ক্রমে আহার্য্য নিঃশেষ হইয়া একেবারে ভাণ্ডার শূন্য হইল, তখন পুরমহিলাদের—ক্ষত্রিয় রমণী-গণের সতীত্ব ও মান-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য নগরের মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করা হইল; সহরের যাবতীয় ক্ষত্রিয়বালা তাহাতে হাসিমুখে ঝম্প প্রদান করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। ভারত-নারী যে প্রবল শত্রুর মুখে ছাই দিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন, এই পথ প্রথমে দাহির-মহিষীই প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

পদ্মিনী

ভারতবর্ষ যে বীরপ্রসবিনী তাহা-রাজস্থানের ইতিহাস পাঠ করিলেই সম্যক জানা যায়। রাজস্থানের আজ আর সে গৌরব নাই সত্য, কিন্তু এক সময়ে উহা বীরাঙ্গনাগণকে বক্ষে ধারণ করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইয়াছিল, একথা ভারতবাসী কখনও ভুলিতে পারিবে না।

রাণা লক্ষ্মণ সিংহ যখন চিতোরের রাণা, তখন পাঠান-রাজ আলাউদ্দীন খিলিজী দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন, লক্ষ্মণ সিংহ নাবালক বলিয়া তাঁহার পিতৃব্য ভীমসিংহ তাঁহার অভিভাবকত্ব করিতেন। পদ্মিনী এই ভীমসিংহেরই পত্নী। রূপে, গুণে তখন পদ্মিনীর মত ভারতে কেহ ছিল না। পথিক পথে যাইতে যাইতে পদ্মিনীর রূপের ব্যাখ্যা করিত। রাখাল গোপাল চরাইতে চরাইতে পদ্মিনীর অসামান্য রূপের আলোচনা করিত। কুল-কামিনীরা একত্র হইলে কেবল পদ্মিনীরই রূপের আলোচনা করিয়া হিংসানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিত। এমন কি পদ্মিণীর রূপের খ্যাতি মিবার রাজ্য ছাড়াইয়া সুদূর দিল্লী পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া ছিল এবং কামিনী-লুব্ধ. ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র আলাউদ্দীনের পদ্মিনী-দর্শন পিপাসা জাগরিত হইয়াছিল। আলাউদ্দীন পদ্মিনীর রূপের খ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য চিতোর আক্রমণ করেন। দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীনের সৈন্য-সংখ্যা যদিও প্রবল এবং তাহার তুলনায় মিবারের সৈন্য সংখ্যা কিছুই নহে, তথাচ রাজপুত বীরগণ স্বদেশ ও স্বজাতির স্বাধীনতা রক্ষা এবং মাতৃজাতির সম্মানরক্ষার জন্য এরূপ অমিতপরাক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন যে, আলাউদ্দীনের সৈন্যগণ অনেকে হতাহত হয়। রাজপুত সৈন্যও যে একেবারে হতাহত না হইয়াছিল,

তাহা নহে। আলাউদ্দীন সৈন্যক্ষয়ে চিতোর জয় ও পদ্মিনীলাভে হতাশ হইয়া ভীমসিংহের নিকট প্রস্তাব করেন যে, তিনি আর যুদ্ধ করিয়া লোকক্ষয় করিতে ইচ্ছা করেন না। একবার মাত্র চিরবাঞ্ছিত পদ্মিনীর মুখখানা দেখিতে পারিলেই তিনি হৃষ্টচিত্তে দিল্লীতে ফিরিয়া যাইবেন।

পদ্মিনীর নিকট এই সংবাদ উপস্থিত হইলে পদ্মিনী বলিলেন, যদি মুকুরে আমার এই কুৎসিত রূপের প্রতিবিম্ব দেখিলে দুর্ব্বৃত্তের লালসার নিবৃত্তি ও সেই সঙ্গে বৃথা নরহত্যা নিবারিত হয়, তাহা হইলে আমি তাহাতে প্রস্তুত আছি। অগত্যা সেই ব্যবস্থা হইল। লম্পট আলাউদ্দীনকে চিতোরের রাজপ্রাসাদে আনয়নপূর্ব্বক স্বচ্ছ দর্পণে পদ্মিনীর রূপের ছবি তাঁহাকে দেখান হইল। সে রূপ দেখিবা মাত্র আলাউদ্দীনের মাথা ঘুরিয়া গেল। পদ্মিনীর রূপ-সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আলাউদ্দীন পূর্ব্বে যাহা শুনিয়াছিলেন, এখন দেখিলেন পদ্মিনীর রূপ তাহার অনেক উচ্চে। এরূপ পদ্মপলাশ আয়ত চক্ষু, কুঞ্চিত কেশদাম, লাবণ্যে ঢল ঢল মুখমণ্ডল, উন্নত প্রশস্ত ললাট, এরূপ গঠন তিনি ত জীবনে কখনও দেখেন নাই। আলাউদ্দীন মজিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া কি উপায়ে পদ্মিনীকে হস্তগত করিবেন, এই উপায় স্থির করিতে লাগিলেন। দুর্ব্বৃত্তের কখনও উপায়ের অভাব হয় না। তিনি ভীমসিংহকে আপন শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ভীমসিংহ রাজপুত। রাজপুত জাতি কপটতা কাহাকে বলে জানে না। অতি বড় শত্রুও অতিথিভাবে আসিলে রাজপুত যেমন তাহাকে মিত্রভাবে অভ্যর্থনা করিতে পারে, তেমনি অতি বড় শত্রুও আমন্ত্রণ করিলে রাজপুত জাতি অকপটে তাহাদের শিবিরে যাইতে পারে। ভীমসিংহ আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইলে নিঃসঙ্কোচে তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইলেন, এক মুহূর্ত্তের জন্য তিনি কোনরূপ বিশ্বাস-

ঘাতকতার আশঙ্কা করেন নাই। যে নিজে বিশ্বাসী, সে সমস্ত জগৎকেই বিশ্বাসী মনে করে। কিন্তু পাষণ্ড আলাউদ্দীনের উদ্দেশ্য অন্যরূপ ছিল। আলাউদ্দীন ভীমসিংহকে আবদ্ধ করিয়া বলিলেন, পদ্মিনীকে না দিলে আমি কখনও ভীমসিংহকে অব্যাহতি দিব না। চিতোরে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল।

কি উপায়ে স্বামীকে পাঠান-কবল হইতে মুক্ত করিতে পারা যায়, পদ্মিনী সাশ্রুনয়নে কেবল সেই চিন্তাই করিতে লাগিলেন; হঠাৎ একটি কৌশল তাঁহার মনে উপস্থিত হইল। তিনি রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গকে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, তিনি আলাউদ্দীনের হস্তে আত্মসমর্পণ করিবার অছিলায় পাঠান-শিবিরে প্রবেশ এবং পতির উদ্ধার সাধন করিবেন। আলাউদ্দীনের নিকট সংবাদ গেল। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী বিনা আয়াসে আত্মসমর্পণ করিবেন, ইহা অপেক্ষা আলাউদ্দীনের পক্ষে আনন্দের সংবাদ আর কি আছে? আলাউদ্দীন সোৎসাহে পদ্মিনীর আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পদ্মিনী আলাউদ্দীনের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, তাঁহার অনেক সহচরী আছেন; তন্মধ্যে ৭শত মাত্র সহচরী তাঁহার সমভিব্যাহারে যাইবেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার সহিত পাঠান শিবিরে অবস্থান করিবেন, আর কেহ কেহ বা চিতোরে ফিরিয়া আসিবেন। পদ্মিনী যে সময়ে পাঠান-শিবিরে যাইবেন সেই সময় কোন পাঠান সৈন্য থাকিতে পারিবে না। তিনি আলাউদ্দীনের নিকট আত্মসমর্পণ করিবার পূর্ব্বে একবার জন্মের মত স্বামী ভীম সিংহকে দেখিয়া যাইবেন।

সত্বর পদ্মিনী-লাভের আশায় উন্মত্ত আলাউদ্দীন পদ্মিনীর চিঠির গূঢ় মর্ম্ম অবগত না হইয়া অমনি তাহাতে সম্মতি দিলেন। এদিকে পদ্মিনীর আদেশক্রমে প্রত্যেক শিবিকায় ৬ জন করিয়া সশস্ত্র রাজপুত

বীর পদ্মিনীর সঙ্গে সঙ্গে পাঠান শিবিরে গেল। পথে কোথাও পাঠান-সৈন্যের সমাবেশ না থাকায় পদ্মিনী অনায়াসে তাঁহার রাজপুত সৈন্য লইয়া ভীমসিংহের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আপন শিবিকায় ভীমসিংহকে তুলিয়া লইয়া কয়েকখানি শিবিকা-সমভিব্যাহারে চিতোর-দুর্গে ফিরিয়া আসিলেন। এদিকে পদ্মিনীর অদর্শনে অস্থির হইয়া নির্ব্বোধ আলাউদ্দীন ভীমসিংহের কারাকক্ষে যাইবামাত্র সশস্ত্র রাজপুত সৈন্যগণ শিবিকা হইতে বাহির হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। পাঠান ও রাজপুত সৈন্যে তুমুল যুদ্ধ বাধিল। সে যুদ্ধে বীরবিক্রম রাজপুত সৈন্যের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া আলাউদ্দীন দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু পদ্মিনীর পদ্মমুখ তাঁহার হৃদয়-দর্পণে প্রতি-ফলিত হইয়া নিশিদিন তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিতে লাগিল। কিছুতেই তিনি পদ্মিনীর মুখচ্ছবি ভুলিতে পারিলে না। তাই কয়েক বৎসর পরে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আলাউদ্দীন পুনরায় চিতোর আক্রমণ করিলেন। এবার চিতোরের দ্বাদশবর্ষীয় বালক পর্য্যন্ত মৃত্যু পণ করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিল। কিন্তু চিতোরের ভাগ্যরবি অস্তমিত হওয়ায় কিছুতেই কিছু হইল না। লক্ষ্মণসিংহ, ভীমসিংহ প্রভৃতি সকলেই প্রকাশ্য যুদ্ধে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। যখন একে একে চিতোরের আশা-ভরসাস্থল যোদ্ধৃবৃন্দ নারীর মান-মর্য্যাদা রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন, তখন পদ্মিনী রাজপুত ললনাকুলের সহিত জ্বলন্ত চিতানলে ঝাম্পপ্রদানপূর্ব্বক রাজপুত নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। চিতোরের গৌরব-সূর্য্য অস্তমিত হইল। জনমানবশূন্য নগর শ্মশানের ন্যায় বিকট হাস্য করিতে লাগিল—ধূ ধূ করিয়া রাজপুত ললনাগণের দেহাবশেষ লইয়া চিতাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল। দুর্দ্ধর্ষ আলাউদ্দীন সেই চিতাধূমের মধ্যে চিতোর দুর্গে প্রবেশ করিয়া পাঠান শক্তির বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিলেন।

শচীমাতা

আমরা এ যাবৎ এমন সব হিন্দু মহিলার বিষয় লিখিয়াছি, যাহারা অসিহস্তে সম্মুখ রণ করিয়াছেন, দ্বাদশবর্ষীয় পুত্রকে হাসিতে হাসিতে সম্মুখ যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছেন, জলন্ত হুতাশনে ঝম্প প্রদান করিয়া আপন সতীত্ব অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন অথবা শঙ্করাচার্য্য, যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় মহা মহা পণ্ডিতগণকে বিচারে পরাজিত করিয়াছেন। কিন্তু ভগবদ্-গুণকীর্ত্তন ও সাধনার জন্য আপন পুত্রকে বলি দিয়াছেন, এরূপ মহিলার কথা বলা হয় নাই।

নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জননী শচীমাতা ছিলেন এইরূপ মহিলা। ১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে এবং শচীমাতার গর্ভে শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সুমধুর অঙ্গসৌষ্ঠব ও গৌরকান্তি-দর্শনে কেহ তাঁহার নাম রাখেন নিমাই, কেহ গৌরাঙ্গ, কেহ বিশ্বম্ভর আবার কেহ বা নবদ্বীপচন্দ্র। গৌরচন্দ্র বড় হইয়া একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। শচীমাতা আপন হস্তে রন্ধন করিয়া পুত্রনির্ব্বিশেষে ছাত্রগণকে খাওয়াইতেন। কখনও অতিথি আসিয়া বিমুখ হইয়া তাঁহাদের বাটী হইতে ফিরিয়া যাইত না। একদিন এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণের স্বহস্তে পক্ব অন্ন নিমাই দুই দুইবার উচ্ছিষ্ট করিয়া দেন, শচীমাতা সেই দুইবারই ব্রাহ্মণের জন্য আবার নূতন করিয়া রন্ধনের জোগাড় করিয়া দেন। অতিথির সেবায় তিনি এক মুহূর্ত্তও ক্লান্তি ও বিরক্তি বোধ করিতেন না। অতঃপর গয়াধামে পিতৃ-শ্রাদ্ধ সারিয়া আসিয়া নিমাই উন্মাদ-গ্রস্তের ন্যায় হন। টোল-চতুষ্পাঠী ছাড়িয়া তিনি অহর্নিশ কেবল হরিনাম করিতে থাকেন। তখন নিমাইয়ের বাটীতে বহু ভক্ত প্রসাদ পাইতেন। নিমাই-জননী শচীমাতা

অতি সমাদরে তাঁহাদের জন্য রন্ধন করিতেন। এইভাবে কিছুকাল যাইল নিমাই কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষা লইবার জন্য রাত্রিকালে শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। নিমাই-জননী পুত্রের বিচ্ছেদ-শোকে অনেক কান্নাকাটি করিলেও তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য কোন প্রকার চেষ্টা করেন নাই। ইহার পূর্ব্বে বিশ্বরূপ তাঁহার গৃহ চিরকালের নিমিত্ত অন্ধকার করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, জগতের সর্ব্বসারাৎসার ভগবানের সন্ধানে গিয়াছেন বলিয়া তিনি সেবারও যেমন মনকে প্রবোধ দিয়াছিলেন, এবারেও তেমনি মনকে প্রবোধ দিলেন।

কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণের অনুরোধে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের বাটীতে আগমন করিলেন, সেখানে পূর্ব্ব হইতেই চন্দ্রশেখর শচীমাতাকে লইয়া আসিয়াছিলেন। শচীমাতা পুত্রের মুণ্ডিত মস্তক ও কৌপীনবাসদর্শনে মনে ব্যথা পাইলেও, পাছে পুত্র ও ভক্তগণ মনে ব্যথা পান, সেজন্য একটি কথাও বলিলেন না। যে কয়েকদিন গৌরাঙ্গদেব শান্তিপুরে ছিলেন, শচীমাতা সে কয়েকদিন আপন হস্তে রন্ধন করিয়া নিমাইকে খাওয়াইতেন। ক্রমে নিমাইয়ের দৃঢ়তার হ্রাস হইল। গৈরিক বাস ত্যাগ করিয়া মায়ের ও বিষ্ণুপ্রিয়ার আনন্দ-বিধানের জন্য পুনরায় গৃহীবেশে নবদ্বীপে যাইবার ইচ্ছা হইল। ভক্তগণ সেই কথা শুনিয়া একে একে সকলে শচীমাতার নিকট গিয়া বলিলেন, "মাতঃ! প্রাণের নিমাই আমাদের পুনরায় সংসারী হইয়া আমাদের মধ্যে বাস করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, এখন আপনার অনুমতি-সাপেক্ষ। আপনি যদি অনুমতি দেন, আপনি যদি একবার মুখ ফুটিয়া বলেন, তাহা হইলেই নবদ্বীপচাঁদ নবদ্বীপে ফিরিয়া যান।"

শচীমাতা ভক্তগণের মুখে এই কথা শুনিয়া বলিলেন—"তোমরা

আমাকে ও কথা বলিও না। পুত্র আমার সন্ন্যাসী হইয়াছে,; বেশ করিয়াছে। এখন যদি আমি তাহাকে সংসারী ও গৃহী হইতে অনুমতি দিই, তাহা হইলে লোকে হাসিবে—মিশ্রবংশের উপর চিরকালের জন্য কলঙ্ক আরোপিত হইবে।” ভক্তগণ ইহার পর শচীমাতাকে আর কোন কথা বলিলেন না। গৌরাঙ্গদেব কিছুদিন শান্তিপুরে থাকিয়া পুরুষোত্তমে চলিয়া গেলেন।

শ্রীশ্রীমাতা সারদা দেবী

১২৬৬ সালের বৈশাখমাসে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি কামারপুকুর হইতে দুই ক্রোশ পশ্চিমে শ্রীশ্রীসারদা দেবীর আবির্ভাব হয়। তাঁহার পিতার নাম শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তখন সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল, ৫।৭ বৎসরের ছোট বালিকাকে খেলার পুতুলের কাছ হইতে ছিনাইয়া লইয়া তাহাকে পাত্রস্থা করিত। তাহার ফল এই হইত যে, এইরূপ সুকুমার বয়সে বালিকার বিবাহ হওয়ায় সে শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে পিতা-মাতার ন্যায় ভক্তি করিত, তাই তখনকার বধূর আগমনে ভাইয়ে ভাইয়ে পৃথকান্ন না হইয়া একান্নবর্ত্তী হইয়াই থাকিত। ঠাকুর রামকৃষ্ণের যখন বিবাহ হয়, তখন তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর মাত্র। দক্ষিণেশ্বরে মায়ের মন্দিরের পূজারীরূপে তিনি উন্মত্তপ্রায় হইয়াছেন, তাই তাঁহার আত্মীয়-স্বজন তাঁহার মাথা ঠাণ্ডা করিবার জন্য—তাঁহার পাগলামী সারাইবার জন্য এই পাঁচ বৎসরবয়স্কা বালিকার সহিত বিবাহ দেন। কিন্তু বিবাহের পরই অমনি ঠাকুর আবার যে পাগল ক্ষুদিরাম সেই ক্ষুদিরামরূপে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া পূজাপার্ব্বণে বসিলেন। ভ্রান্ত লোকে বুঝিল নারীর দেহ-সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া সংসার-কারাগারে আবদ্ধ হইবার জন্য রামকৃষ্ণের মস্তিষ্কের বিকৃতি হয় নাই—রামকৃষ্ণ সংসার-কারাগার ছাড়িবার জন্য পথের অন্বেষণ অরিতেছেন।

বিবাহের দুই বৎসর পরে রামকৃষ্ণ একবার শ্বশুরালয়ে গিয়াছিলেন, কিন্তু সারদা দেবীর বয়স তখন সবে সাত বৎসর মাত্র, তিনি লজ্জায় স্বামীর কাছেই পর্য্যন্ত আসেন নাই। ইহার পর দীর্ঘ আট বৎসর কাল মায়ের সহিত ঠাকুর রামকৃষ্ণের আর দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই। মা এখন আর সাত বৎসর-বয়স্কা বালিকা ন'ন, তিনি পঞ্চদশবর্ষীয়া উদ্ভিন্নযৌবনা।

পিত্রালয় হইতে তিনি শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন; আসিয়া পাইলেন—স্বামীর নিকট হইতে এক অপূর্ব্ব সংসারকলুষবিরহিত বিশুদ্ধ "অনাবিল ঐশ্বরিক প্রেম। সে প্রেমে না ছিল ভোগের তীব্র পূতিগন্ধ, না ছিল অদম্য সংসার-পিপাসার মরীচিকা। রামকৃষ্ণ বহুদিন পরে সহধর্ম্মিণীকে দেখিয়া তিনি যে বিবাহিত সে কথা তাঁহার মনে পড়িল। স্ত্রীর নিকট অনুমতি লইয়া তবে সাধন-ভজনে ব্যাপৃত হওয়া আবশ্যক তাহা ভাবিলেন। তাই প্রথম সাক্ষাতেই তাহার পদপ্রান্তে পড়িয়া বলিলেন বলিলেন, "মা—মা যদি তুই এসেছিস—মূর্ত্তিমতী হ'য়ে যদি দেখাই দিয়েছিস্, তবে একবার অনুমতি দে মা—প্রাণভরে সাধন ভজন করি গিয়ে!" মা স্বামিদেবতার ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তি দেখিয়া স্বামীকে অনুমতি দিয়া এক নূতন জীবন লইয়া পিত্রালয়ে ফিরিলেন। সংসার-মরুর মাঝে মাতৃত্বের উৎস লইয়া তৃষিত পথিকের পিপাসা মিটাইতে তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। এক অনন্তজীবনের অফুরন্ত কর্ম্মপ্রেরণা তিনি হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করিলেন। স্বামীর ভগবদ্ভক্তি বিদ্যুৎ-প্রবাহের মত তাঁহার ধমনীর ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। স্বামী দেবতা—স্বামী ভগবান্—স্বামী সাক্ষাৎ পরমেশ্বর—এ বাণী তাঁহার কর্ণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিল। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, সময় হইলেই তিনি তাঁহাকে নিজের কাছে ডাকিয়া লইবেন। মা আমার দিনের পর দিন পর সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় কাটাইতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে তিনি আপন মনে গাইতেন—

"এমন দিন কি হ'বে মা তারা
যবে তারা তারা তারা ব'লে
দু'নয়নে বইবে ধারা।
হৃদি-পদ্ম উঠ্‌বে ফুটে
মনের আঁধার যাবে টুটে—

আমি ধরাতলে পড়ব লুটে
তারা বলে হ'ব সারা ॥"

মায়ের এই অবস্থা দেখিয়া একদিকে তাঁহার গ্রামবাসিগণ যেমন তাঁহাকে পাগলিনী বলিতে লাগিল, অমনি অন্যদিকে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ দেবের ভাব দেখিয়া সকলে তাঁহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল। মায়ের কর্ণে সে উপহাস পৌঁছিল। তাঁহার স্বামী পাগল—এ চিন্তা করিতেও তাঁহার যেন বুক ফাটিয়া যাইত। তিনি স্বামীকে দেখিবার জন্য পিতার সহিত কলিকাতায় আসিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে অবহেলা করিলেন না। মায়ের বহুদিনের মনোবাঞ্ছা এতদিনে পরিপূর্ণ হইল—মা আমার স্বামীর পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার নিকট কত না ধর্ম্মের কথা শুনিতে লাগিলেন। হর-পার্ব্বতীর মত মা-বাবা দীর্ঘ একবৎসর একত্র মায়ের পূজার্চ্চনা করিতে লাগিলেন। কঠোর সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যে দুই জনেই উত্তীর্ণ হইলেন—ঠাকুর মাকে সাক্ষাৎ জগদম্বা বলিয়া বুঝিতে পারিলেন।

ক্রমে ১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠমাস আসিল। গ্রীষ্মের শুষ্কপ্রায় তটিনী বর্ষার বারিপাতে পরিপূর্ণ-কলেবরা হইল—নিদাঘ-তাপদগ্ধ প্রস্তর-কঠিন মৃত্তিকা প্রাবৃট-সলিল-অভিসিঞ্চনে সিক্ত ও আর্দ্র হইল, বহিঃপ্রকৃতিতে রসের সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের হৃদয়ক্ষেত্রে মাতৃ-ভক্তির ফল্গুধারা প্রবাহিত হইয়া পড়িল। ঠাকুর জ্যৈষ্ঠমাসের অমাবস্যায় মাকে পীঠস্থানে বসাইয়া তাঁহাকেই মাতৃ-সম্বোধনে পূজা করিয়া মায়ের চরণে আত্ম-নিবেদন করিলেন—ঠাকুরের মাতৃসাধনার আজ পূর্ণ উদ্‌যাপন হইল।

তার পর লীলার অবসানে ঠাকুর পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, মা তাঁহার সন্তানবর্গকে লইয়া তাহাদের লালন-পালন করিতে লাগিলেন। মা স্বহস্তে রন্ধন করিতেন, পরিবেশন করিতেন, সন্তানের বিষ্ঠা-মূত্র পরিষ্কার করিতেন—এক হাতে গার্হস্থ্য ও অন্য হস্তে সন্ন্যাস—

জীবনের আদর্শ বজায় রাখিয়া মা দীর্ঘ ৫০ বৎসরকাল সেবাধর্ম্মের ব্রত পালন করিলেন। বাবা রামকৃষ্ণকে হারাইয়া যেসব ভক্ত মুহ্যমান হইয়াছিল তাহারা সকল বিয়োগ-ব্যথা ভূলিল—মায়ের সন্তান-বাৎসল্য দর্শন করিয়া।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

ভুবনবিখ্যাতা বিদূষী দেশহিতব্রতা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ১৩ ফেব্রুয়ারী হায়দ্রাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ডক্টর ৺অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণগ্রামের চট্টোপাধ্যায়-বংশীয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে অঘোরনাথ এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিজ্ঞানের শেষ উপাধি—Doctor of Science উপাধি লইয়া হায়দ্রাবাদে আসিয়া নিজাম কলেজ স্থাপন করেন। তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত শিক্ষাবিভাগে কার্য্য করিয়াছিলেন। বিদ্বান্ পিতা তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা সরোজিনীকে বিশেষ শিক্ষা দান করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। সরোজিনী আত্মপরিচয় দিবার প্রসঙ্গে লিখিতেছেন—"আমার পূর্ব্বপুরুষগণ সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া পর্ব্বত ও গিরিগুহা ভালবাসিতেন, তাঁহারা অত্যন্ত চিন্তাশীল, প্রগাঢ় পণ্ডিত ও সাধু সন্ন্যাসীর মত ছিলেন। আমার পিতা সারাজীবন যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছেন, তৎসমস্তই অন্যকে সাহায্য ও নিজ রসায়নাগারে গবেষণার জন্য ব্যয় করিয়াছেন। তাঁহার উদ্যানে প্রতিদিনই শিক্ষিত লোকদিগের সভা বসিত এবং যে কেহ নূতন কোন তথ্য লইয়া উপস্থিত হইতে পারিতেন তাঁহাকেই তিনি ভাইয়ের মত স্নেহভরে আলিঙ্গন করিতেন; দিনরাত তাঁহার রসায়নাগারে পরীক্ষা চলিত।"

আপন কবিত্ব-শক্তির বিকাশ সম্বন্ধে সরোজিনী লিখিয়াছেন, "আমি যখন বালিকা তখন হইতে যদিও আমার হৃদয় অনেকটা নির্জ্জন চিন্তার প্রতি অনুরক্ত ছিল, তথাপি আমি কখনও কবিতা লিখিব বলিয়া কল্পনাও করি নাই। আমার পিতা আমাকে বৈজ্ঞানিকভাবেই শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, আমি হয় একজন শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ

না হই, একজন বৈজ্ঞানিক হইব। আমার বয়স যখন এগার বৎসর তখন বীজ-গণিতের একটি অঙ্ক আমি কষিতে না পারিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া একটি বড় কবিতা লিখিয়া ফেলিলাম। সেইদিন হইতে আমার কাব্য-জীবন আরম্ভ হইল। ত্রয়োদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে আমি Lady of the Lakeএর প্রতি লক্ষ্য করিয়া একটি দীর্ঘ কবিতা লিখিয়াছিলাম, সেই কবিতাটী ১৩০০ পংক্তি। কবিতাটী লিখিতে আমার ছয় দিন মাত্র সময় লাগিয়াছিল। ঐ বয়সে এক সময়ে পীড়িত হওয়ায় চিকিৎসক আমাকে বই পড়িতে নিষেধ করায় আমি ২০০০ দুই হাজার পংক্তির একখানি নাটক লিখি। এই সময়ে আমার স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হয়; ধরাবাঁধা পড়াশুনা আমার এই সময়ে বন্ধ হওয়ায় আমি লাইব্রেরীর বই পড়িতে থাকি। আমি এই সময়ে একখানি উপন্যাসও লিখিয়াছিলাম।"

উপরোক্ত উদ্ধৃতাংশ হইতে বুঝা যায়, কবিতা-রচনায় বাল্যজীবন হইতে কিরূপ বলবতী স্পৃহা তাঁহার হৃদয়ে জাগরিত হইতেছিল। মাত্র বার বৎসর বয়সে সরোজিনী মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে প্রেরিত হন এবং সেইখানে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাস করেন। ইংলণ্ডে প্রথমে তিনি কিংস কলেজ, তার পর গির্টন কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ইটালীতে যান। ভার্জিল ও দান্তের জন্মভূমি ইটালি দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে কবিত্বশক্তি আরও পরিস্ফুট হয়।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সরোজিনী হায়দ্রাবাদে প্রত্যাগমন করিয়া ডাঃ নাইডুকে বিবাহ করেন। বলা বাহুল্য, ডাক্তার নাইডু ভিন্নজাতীয় ছিলেন। তাঁহার চারিটী সন্তান; তন্মধ্যে দুইটী পুত্র ও দুইটী কন্যা। বিবাহিত জীবন তাঁহার অতি সুখেই কাটিয়াছিল, তিনি কবিত্বশক্তি বিকাশ করিবার যথেষ্ট অবসর পাইতেন। তিনি ভারতবর্ষের নানা স্থলে সভা-

সমিতিতে বক্তৃতা করিয়া দেশের ও জাতির উন্নতিকল্পে অনেক চেষ্টা করিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ লেখক ডাইভার তাঁহার English woman in India নামক গ্রন্থে সরোজিনী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"তিনি এখন হায়দ্রাবাদে বাস করিতেছেন। এই হায়দ্রাবাদে অগণ্য নারী পর্দার আড়ালে থাকিয়াও পারশ্য ও আরব্য ভাষায় সুপণ্ডিত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সামাজিক সম্মিলনের সূত্রস্বরূপ এখানে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বিরাজিতা। এই হায়দ্রাবাদ সহরটী স্নেহ, প্রেম ও প্রীতির উৎস। অন্তঃপুরবাসিনী হইলেও শ্রীমতী সরোজিনীর প্রভাব অসামান্য।" সরোজিনী অতি মধুরভাষিণী, বাগ্মী এবং একজন উচ্চ শ্রেণীর কবি, এই কয়টী অসামান্য গুণের সমবায়ে সরোজিনীর জীবন অতি মনোরম হইয়াছে।

The Golden Threshhold এবং The Bird of Time নামক দুইখানি কবিতা-গ্রন্থের জন্য তিনি বিখ্যাত কবিগণের মধ্যে স্থান পাইয়াছেন। মিঃ আর্থার সাইমনস্ "The Golden Threshhold" নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—'It was the desire of beauty that made her a poet; her nerves of delight are always quivering at the contact of beauty. To those who knows her in England, all the life of the tiny figure seemed to concentrate itself in the eyes; they turned towards beauty as the sunflower turns towards the sun, opening wider and wider until one saw nothing but the eyes."

ভারতবর্ষের মধ্যে দুইজন মহিলা—ইংরাজী ভাষায় কবিতা লিখিয়া জগদ্বিখ্যাতা হইয়াছেন। সে দুইজন আর কেহই নহেন—একজন তরু দত্ত ও অন্য জন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু। কিন্তু তরু দত্তের কবিতা অপেক্ষাও সরোজিনীর কবিতা প্রাণস্পর্শী। যে এডমণ্ড গস তরু দত্তের

পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়াছেন সেই এড্‌মণ্ড গসই আবার সরোজিনীর পুস্তক "The bird of time"এর ভূমিকা-লিখন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"first showed her the way to the Golden Threshhold of our country comes to be written, there is sure to be a page in it dedicated to this fragile exatic blossom of song." তরু দত্তের কবিতার বিশেষত্ব এই যে, তাহা সরল ও অকপট। কিন্তু সরোজিনীর জটিল ও তাহাতে কবিত্ব পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। সরোজিনীর কবিতায় যে কতটা কবিতা-নৈপুণ্য পরিস্ফুট তাহা এড্‌মণ্ড গসের নিম্নলিখিত উক্তি হইতে বুঝা যাইবে :—

I implored her to consider that from a young Indian of extreme sensibility, who had mastered not merely the language but the prosody of the West, what we wished to receive was not a *rechauffle* of Anglo-saxon sentiment in Anglo-saxon setting, but some revelation of the heart of India, some sincere penetrating analysis of native passion, of the principles of antique religion and such mysterious intimations as stirred the soul of the East long before the West had begun to dream that it had a soul......with the docility and the rapid appeciation of genius. Sarojini instantly accepted and with as little delay as possible acted upon this suggestion. Since 1895, she has written, I believe, no copy of verses which endeavours to conceal the exclusively Indian source of her inspiration. She springs from the very soil of India ; her spirit, although it employs the English language as its vehicle, has no other tie with West.

শ্রীমতী সরোজিনীর যাবতীয় কবিতাই আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ। তাঁহার কবিতা পাঠ করিতে করিতে পাঠক এই মরজগৎ ছাড়িয়া

এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে গিয়া উপনীত হন। জেবন্নিসার মুখ দিয়া আপন সৌন্দর্য্যবর্ণনপ্রসঙ্গে কবি সরোজিনী বলিতেছেন—

When from my cheek I lift my veil,
The roses turn with envy pale
And from their piereed hearts, rent with pen
Send forth their fragrance like a veil.
Or if perchance some perfumed trees
Be loosened to the wind's caress
The honeyed hayacinths complain
And when I pause still groves among
Such loveliness is mine a throng
Of nightingles awake and strain
Their souls into a quivering song."

ধ্যানস্তিমিতনেত্র বুদ্ধদেবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সরোজিনী বলিতেছেন—

Lord Budha, on Thy Lotus throne,
With praying eyes and hands elate,
What mystic rapture dost Thou own,
Immitable and unravished of our ken
Annihilate from the world of men ?

বস্তুতঃ শ্রীমতী সরোজিনীর এত অসংখ্য কবিতা আছে যে, সে সব উদ্ধৃত করিতে গেলে একখানি বৃহদাকার পুস্তক হয়। কাজেই এ স্থলে তাহার উল্লেখ না করিয়া তাঁহার জীবনের অন্যদিকের মহত্ব ও প্রতিভার পরিচয় দিব।

কয়েক বৎসর যাবৎ সরোজিনী সামাজিক ও রাজনীতিক সভা-সমিতিতে স্বাধীনভাবে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মাদ্রাজের একেশ্বরবাদী কন্‌ফারেন্সে "ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানুষের

ভ্রাতৃত্ব" সম্বন্ধে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে সরোজিনী বলেন—"প্রত্যেক লোকেরই জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে ভ্রাতার ন্যায় প্রত্যেককে ভালবাসা কর্ত্তব্য।"

পচিয়াপ্পা কলেজের ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া সরোজিনী বলেন, "তোমরা উত্তরাধিকারসূত্রে অনেক কর্ত্তব্য পাইয়াছ। তোমরা কে ও কি তাহা ভাবিবার প্রয়োজন নাই। এমন কি রাস্তার মুটে মজুরের পর্য্যন্ত স্বদেশী কার্য্য ও স্বদেশের চিন্তা করিবার অধিকার আছে। প্রত্যেককেই দেশের উন্নতির জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে।"

মহাত্মা গান্ধীকে সরোজিনী গৌতম বুদ্ধ, চৈতন্য, রামানুজ বা রামকৃষ্ণের মত অবতারস্বরূপ বলিয়া মনে করেন। মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে তাঁহার মত এই যে, আধ্যাত্মিক হিসাবে হয়ত মহাত্মা গান্ধী গৌতম বুদ্ধ প্রভৃতি অপেক্ষা একটু নিম্নস্তরে অবস্থিত হইতে পারেন, কিন্তু স্বদেশপ্রেম, অকপট সেবা এবং সরলতায় তিনি তাঁহাদের তুলনায় কোন অংশেই হীন নহেন।

শ্রীমতী সরোজিনী যদিও কবি বলিয়া প্রসিদ্ধা, তাহা হইলেও তাঁহার রাজনীতিক বক্তৃতা-সমূহে কম রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় নাই। তাঁহার বক্তৃতাসমূহ পাঠ করিলে তাঁহাকে একজন উচ্চ রাজনীতিবেত্তা বলিয়া প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে ভারতে স্বায়ত্ত শাসনের প্রস্তাব অনুমোদন-প্রসঙ্গে শ্রীমতী নাইডু বলেন, "আমাদের এখন প্রত্যেকের কর্ত্তব্য একত্র মিলিত হইয়া মাতৃভূমির উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা। মাতৃভূমির জন্য কষ্টভোগ করিলে তাহাতে আনন্দ আছে; মাতৃভূমির জন্য মরিলে সে জীবন অবিনশ্বর ও অক্ষয় হয়।"

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের পর শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ভারতের নানাস্থানে রাজনীতিক বক্তৃতা করিয়া বেড়ান। হিন্দু-মুসলমানের একতা সম্বন্ধে পাটনার একটি সভায় তিনি বলেন, "কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে যখন প্রথম

মুসলমান অভিযান ভারতবর্ষে আসিয়াছিল তখন তাহারা পবিত্র গঙ্গা-তীরে অবস্থান করিয়া গঙ্গার সলিলে তাহাদের তরবারি শীতল করিয়াছিল। তাহারাই কালক্রমে ভারতবর্ষের সন্তান হইয়াছে। মুসলমানেরা এদেশে তাহাদের বাড়ীঘর প্রস্তুত করিয়া বাস করিতে আসিয়াছেন, এদেশকে ধ্বংস করিয়া এদেশের ধন-রত্ন লুণ্ঠন করিবার জন্য তাঁহারা এদেশে আসেন নাই, তাঁহারা এদেশে বাস করিয়া এদেশের উন্নতি-বিধানের জন্যই নূতন বংশাবলী সৃষ্টি করিয়াছেন। এদেশের যাহারা সন্তান, তাহাদের সহিত তাঁহারা কেমন করিয়া পৃথক্‌ভাবে বাস করিবেন? ইতিহাস যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা কি বলিতে পারেন যে, পূর্ব্বে হিন্দু-মুসলমান পৃথক্‌ভাবে বাস করিত? ইংলণ্ডে যখন ইজিপ্ট, আল্‌জিরিয়া, ভারত বা তুর্কবাসীর সহিত সাক্ষাৎ হয় তখন কেহ কি ভাবে অমুকের বাড়ী ভারতে আর অমুকের বাড়ী তুর্কদেশে?

সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে হিন্দু মুসলমান কি ভাই ভাই রূপে বাস করে নাই? আমি যে প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং যে প্রদেশ হইতে আসিতেছি সেই প্রদেশ দুই শত বৎসর ধরিয়া মুসলমান রাজা শাসন করিতেছেন। সেই প্রদেশের হিন্দু অধিবাসীরা আদৌ বুঝিতে পারে না তাহারা হিন্দুশাসনাধীনে না মুসলমান শাসনাধীনে আছে? আমি ভূমিষ্ঠ হইয়াই মুসলমান সঙ্গিনী ও সহচরীদের সহিত একত্র ক্রীড়া করিয়াছি।”

১৯১৭ সালে মাদ্রাজে প্রেসিডেন্সী এসোসিয়েসনে জাতির মিলন-সম্পর্কীয় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “জাতিতে জাতিতে পার্থক্য কেন থাকিবে? প্রাচীনকালে কি এইরূপ জাতিভেদ ছিল? লোকে কেবল মাত্র স্ব স্ব জীবিকার জন্য ভিন্ন ভিন্ন রূপ কর্ম্ম ও ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু আমরা এক্ষণে সেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শ্রমজীবি-

গণকে স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত করিয়া এবং তাহাদের প্রতি ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কি ভাল কাজ করিতেছি?"

কলিকাতা কংগ্রেসেও শ্রীমতী নাইডু সুন্দর বক্তৃতা করিয়া স্বায়ত্ত-শাসনের প্রস্তাব পাশ করেন। তিনি মুসলমানদিগের সভাতেও আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের মুক্তির জন্য বক্তৃতা করেন।

বিজাপুরে বোম্বাই প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের যে সভা হয় তিনি সে সভাতেও উপস্থিত হইয়া নারীর অধিকার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, পুরুষের যেমন মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও ব্যায়ামাদির অধিকার আছে, নারীরও তেমনি আছে। ভারতের নারীশক্তি না জাগিলে কখনও এ দেশের উন্নতি হইবে না।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে সরোজিনী মাদ্রাজ প্রদেশিক কন্‌ফারেন্সের কন্‌জি-ভারাম অধিবেশনে সভানেত্রীত্ব করেন।

শ্রীমতী সরোজিনী তার পর দিল্লী, জলন্ধর, লাহোর, হায়দ্রাবাদ এবং অন্যান্য নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বক্তৃতা করেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বোম্বাই স্পেশাল কংগ্রেসে নারীর অধিকারের প্রস্তাব সমর্থন করেন।

গত ডিসেম্বর মাসে তিনি দিল্লী নিখিল ভারতীয় সামাজিক সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে সভানেত্রীত্ব করেন। সেই সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন—"দিল্লীর রাজন্যগণ আজ নাই সত্য এবং তাঁহাদের মর্ম্মর প্রাসাদ ও দুর্ভেদ্য দুর্গ আজ ধ্বংসাবশিষ্ট হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা যে সত্যের জন্য যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছেন সেই সত্য এখনও ভগ্ন প্রাসাদের বাতায়ন দিয়া আসিয়া আমাদিগকে সত্যের পথে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিতেছে। তাঁহাদের কি সত্য ছিল? কি সত্যের জন্য আজ এই দিল্লী কবর না হইয়া মন্দিরে পরিণত

হইয়াছে? সেই সত্যই হইল ধর্ম্ম। দেশের উন্নতির জন্য—জন্মভূমির সম্মানের জন্য প্রাণত্যাগও তাঁহারা ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন।"

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডি-এল উপাধি দিতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই—ধন্যবাদের সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। শ্রীমতী সরোজিনী বর্ত্তমানে বোম্বাই কর্পোরেশনের নির্ব্বাচিত সভ্য। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন ও জাতীয় মহাসমিতির তিনি একজন অকৃত্রিম সদস্য। অধুনা তাঁহার যত কিছু চিন্তা ও কল্পনা সমস্তই তিনি মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্ত্তিত অহিংস অসহযোগ ব্রতের জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন। বাঙ্গালা তাঁহার পিতৃ-পিতামহের জন্মভূমি বলিয়া গৌরবান্বিত। তিনিই আজ মাদ্রাজকে বাঙ্গালার সহিত পবিত্র যোগসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছেন।

কানপুরে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির যে অধিবেশন হয়, শ্রীমতী সরোজিনী তাহাতে সভ্যানেত্রীত্ব করিয়াছিলেন।

রমাবাই

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে বোম্বাইয়ের সন্নিকটে পশ্চিম ঘাটের কিছু দূরে গঙ্গামার্গ জঙ্গলে রমা ভূমিষ্ঠ হন। ইঁহার পিতার নাম অনন্ত মিশ্র। রমার শিক্ষার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। প্রথম অবস্থায় রমার হস্তে কোন পুস্তক দেওয়া হয় নাই। রমা মাতার মুখে ভাগবতের শ্লোক শুনিয়া অতি শৈশবেই শ্রীমদ্ভাগবত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। রমার মাতাপিতা বালিকা রমাকে লইয়া অনেক তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তীর্থভ্রমণকালেও রমা নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন। পথ-পর্য্যটনের শ্রান্তি একদিনের জন্যও তাঁহার অধ্যয়ন-স্পৃহা নষ্ট করিতে পারে নাই। অতঃপর রমার বয়স যখন ষোড়শ বৎসর, তখন তাঁহার জনক-জননীর মৃত্যু হয়। রমাবাই এই অল্প বয়সে মাতা পিতার মৃত্যুতে সাতিশয় দুঃখিত হন বটে, কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার যত্নে ও ভালবাসায় তিনি অচিরে মাতৃপিতৃশোক বিস্মৃত হন। মাতৃ-পিতৃ-শোকেও রমা অধ্যয়ন-স্পৃহা পরিত্যাগ করেন নাই।

অতঃপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত রমাবাই ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে থাকেন এবং স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে বক্তৃতা করিতে থাকেন। তখনকার দিনে স্ত্রীলোকদিগের কার্য্য রন্ধনাগারের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত, স্ত্রীলোকের যে আবার বিদ্যাশিক্ষার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে—ইহা কেহ স্বীকার করিতেন না। রমা বলিতেন, কুমারীগণকে সংস্কৃত ভাষায় বিশেষরূপ শিক্ষা দিয়া তবে তাহাদের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোক না জাগিলে কখনও এ দেশ জাগিবে না। যেমন লোকের এক পা পঙ্গু থাকিলে সে অন্য পায়ে ছুটিতে পারে না, তদ্রূপ স্ত্রীলোক অজ্ঞানান্ধ-

কারে আচ্ছন্ন থাকিলে কিছুতেই দেশে স্বাধীনতা আসিতে পারে না। রমাবাই সংস্কৃতশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি একবার কলিকাতায় আসিয়া মেট্রোপলিটন স্কুল প্রভৃতিতে ভাগবতের তত্ত্ব-ব্যাখ্যা ও ধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ পণ্ডিত ৺বিদ্যাসাগর, ৺মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রভৃতি মনীষিগণ রমাবাইয়ের সহিত কথোপকথন করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। রমার জীবনের উদ্দেশ্যই ছিল দেশে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার। রমাবাই বিজাতীয় ভাষায় দেশের বালিকাগণকে শিক্ষা দিবার ঘোর বিরুদ্ধে ছিলেন। বাঙ্গালার পণ্ডিতগণ রমাকে বহু মূল্যবান উপহার ও "সরস্বতী" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। রমা এলাহাবাদে অবস্থান করিতেন। কলিকাতা হইতে এলাহাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে রমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হয়। অতঃপর অভিভাবকহীন হওয়ায় রমা বিপিন-বিহারী মেধাবী নামক এক শূদ্রধরকে বিবাহ করেন। বিপিনবিহারী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ছিলেন। এই শূদ্রধরের ঔরসে রমার একটি কন্যা জন্মে। কন্যাটি অদ্যাপি জীবিত আছে। রমা অধিক দিন স্বামী-সংসর্গজনিত সুখ উপভোগ করিতে পারেন নাই। বিবাহের দেড় বৎসর পরেই তিনি বিধবা হন। বিধবা হইবার পর রমার কার্য্য সংসারের সামান্য গণ্ডী হইতে বিস্তৃততর ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়। রমা "আর্য্যমহিলা সমাজ" প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর রমা ইউরোপে যান, তথায় গিয়া তিনি উত্তমরূপে ইংরাজী সাহিত্য ও ভাষা আয়ত্ত করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ইউরোপের একটি কলেজের সংস্কৃত সাহিত্যের প্রফেসর নিযুক্ত হন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে রমা ইউরোপ হইতে আমেরিকায় গমন করেন।

রমাবাই কোন স্কুল-কলেজে না পড়িয়া আপন চেষ্টা ও অধ্যবসায়-বলে সামান্য গৃহস্থ বালিকা হইতে ইউরোপীয় কলেজের অধ্যাপিকা

পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। রমাবাইকে এদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি ছিলেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষার যোগসূত্র। তিনি প্রাচ্য আদর্শেই ভারতের দেবভাষাতেই ভারতীয় মহিলাগণকে শিক্ষা দিবার পক্ষপাতিনী ছিলেন। নতুবা বোধ হয়, আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার প্রচারকগণের মুখে মুখে তাঁহার নাম পরিবর্ত্তিত হইত। রমাবাই আমাদের দেশের গৌরব ছিলেন।

বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবী

দয়ার সাগর ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরমহাশয় যে সকল মহৎ গুণের জন্য বাঙ্গালার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় নাম রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার মূল উৎস তাঁহার দেবীপ্রতিমা জননী ভগবতী দেবী। ভগবতী দেবী শৈশবে নিজের মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতুলালয়ের নিকট কয়েকটি দুঃস্থ দরিদ্র পরিবার বাস করিত। ভগবতী দেবী অনেক সময় তাহাদিগকে অন্নদান করিতেন। ইহা দেখিয়া ভগবতী দেবীর মাতা তাঁহাকে একদিন বলিলেন, "মা পরের বাড়ীতে থাকিয়া এত দান-ধ্যান করা শোভা পায় না, তোমার মামা জানিতে পারিলে রাগ করিবেন।" কিন্তু ভগবতী দেবী বলিলেন, "মামা যদি নিতান্তই রাগ করেন, তবে তাঁহাকে একটি চরকা কিনিয়া দিতে বলিও; আমি অবসর-সময়ে চরকায় সূতা কাটিয়া যাহা পাইব, তাহা দ্বারা এই সমস্ত দুঃস্থ, দরিদ্রের সেবা করিব।" ভগবতী দেবীর যখন বিবাহ

হয়, তখন তাঁহার শ্বশুরগৃহের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল। একবার এক অতিথি আসিয়া তাঁহাদের বাড়ীতে দিবা দ্বিপ্রহরে উপস্থিত হয়। বাড়ীতে তখন সকলের আহারাদি হইয়া গিয়াছে। গৃহে এক মুষ্টি তণ্ডুল নাই। ভগবতী দেবীর শ্বাশুড়ী দুর্গাদেবী অতিথিকে বিনীতভাবে বলিলেন, "ঠাকুর! আমাদের ঘরে আজ কিছুই নাই, আপনি দয়া করিয়া অন্যত্র যাউন, আমাদের কোন অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।" অন্য গৃহ হইতে ভগবতী দেবী এই কথা শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ এক প্রতিবেশিনীর নিকট গিয়া হাতের একগাছি পৈছা বাঁধা দিয়া চাউল এবং দাইল লইয়া আসিলেন এবং সেই চাউল দাইল রাঁধিয়া সেই অতিথিকে আহার করাইলেন।

একদিন বালক ঈশ্বরচন্দ্র রাস্তায় একজন ভিখারীকে বস্ত্রহীন অবস্থায় দেখিতে পাইয়া নিজের ভাল কাপড়খানি তাহাকে দিয়া তাহার ছিন্ন কাপড়ের টুকরাখানি পরিয়া বাড়ীতে ফিরেন। মাতা ভগবতী পুত্রের পরিধানে বস্ত্র না দেখিয়া প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা কাপড় কি হইল?" ঈশ্বরচন্দ্র আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বলায় মাতা ভগবতী দেবী তাহাতে অসন্তুষ্ট হওয়া দূরের কথা, বরং পরম সন্তুষ্টা হইলেন এবং বলিলেন, "গরীব-দুঃখী কাঙ্গালকে এইভাবে দয়া করিতে হয়, নতুবা তাহারা পাইবে কোথায়?" ভগবতী দেবী চরকায় সূতা কাটিয়া ঈশ্বর-চন্দ্রকে আর একখানি নূতন কাপড় বুনাইয়া দিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগরমহাশয় পরবর্ত্তী জীবনে যখন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালী ও ইন্‌স্পেক্টরী করিয়া মাসিক ৫০০৲ টাকা বেতন পাইতেন ভগবতী দেবী তখন স্বহস্তে রন্ধন করিতেন। দ্বিপ্রহরে রন্ধনাদি সারিয়া ভগবতী দেবী বাড়ীর সদরে গিয়া দাঁড়াইতেন, সেই পথ দিয়া হাটুরিয়া-গণ হাটে যাওয়া-আসা করিত। ভগবতী দেবী হাটুরিয়াদের মধ্যে যাহারই মুখ শুষ্ক দেখিতেন, তাহাকেই ডাকিয়া বলিতেন, "আহা বাছা

এখনও বুঝি খাওয়া হয় নাই, এস এস, গরীব ব্রাহ্মণের বাটী দু'টি খেয়ে সুস্থ হ'য়ে যাবে।

বাড়ীতে কোন ক্রিয়া-কর্ম্ম উপস্থিত হইলে দরিদ্র-দুঃস্থেরা মাছের কাঁটা-কুটি লইবার জন্য আসিত, ভগবতী দেবী কাঁটা-কুটির সঙ্গে কিছু কিছু মাছও প্রত্যেককে দিয়া দিতেন। স্বামী ঠাকুরদাস বলিতেন, "ওরূপভাবে গরীবদুঃখীদের মাছ দিলে যে ব্রাহ্মণের কম পড়িবে।" উত্তরে ভগবতী দেবী বলিতেন, "মাছ কি কেবল তোমার ব্রাহ্মণেরাই খাইবে? কেন এই দরিদ্র দুঃস্থেরা কি কেউ নয়?"

ঠাকুরদাস শেষ বয়সে কাশীবাসী হইলে ঈশ্বরচন্দ্র মাতা ভগবতী দেবীকেও পিতার নিকট পাঠাইয়া দেন। ভগবতী দেবী তথায় কিছুকাল থাকিবার পর গ্রামে ফিরিয়া আসেন এবং বলেন, "এতদিনে সত্য সত্য কাশীধামে আসিলাম। যেখানে প্রকৃত দীন দরিদ্র হাত পাতিয়া ভিক্ষা লয়, যেখানে নিরন্নকে অন্ন দিবার সুযোগ পাওয়া যায়, সেই ত আমার কাশী। আমার কাশী বীরসিংহ।"

বিদ্যাসাগরমহাশয় যখন প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছিলেন, সেই সময়ে একদিন মাকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! তোমার কি কোন গহনা পরিতে সাধ হয়?" মাতা ভগবতী দেবী বলিলেন, "হাঁ বাবা! আমার তিনখানি গহনা পরিতে সাধ হয়—(১) দেশের ছেলেমেয়েরা মূর্খ হইয়া যাইতেছে, আমার ইচ্ছা তাহাদের জন্য একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় (২) দেশের সকল লোকে চিকিৎসার অভাবে মারা যাইতেছে, আমার বড় সাধ তাহাদের জন্য একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা হয় (৩) গরীব-দুঃখীর ছেলেদের জন্য একটী অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, আর সেই সঙ্গে তাহাদের জন্য একটি অন্নসত্র প্রতিষ্ঠিত হয় ইহাও আমার সাধ। বাবা যদি তুমি আমার উপযুক্ত পুত্র হও, তবে মায়ের এই তিনখানি গহনার ব্যবস্থা কর। বলা

বাহুল্য, বিদ্যাসাগর মহাশয় মায়ের এই তিনটি সাধই পূর্ণ করিয়া ছিলেন।

ভগবতী দেবীর নিকট হইতে প্রায়ই গ্রামের দরিদ্র রমণীরা টাকা ধার লইত, তাহারা সেই ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া কাঁদাকাটা করিত। তিনি তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেন, "টাকা শুধ্‌তে পারছিস্ না ব'লে এত কান্নাকাটি কেন, যখন পারবি তখন দিবি।" কখনও কখনও টাকার নিতান্ত দরকার হইলে তিনি নিজে টাকার তাগাদায় পাড়ায় বাহির হইতেন; কিন্তু ঋণ-গ্রস্তাদের শুষ্ক মুখ দেখিয়া তাঁহার প্রাণ এরূপ বিগলিত হইত যে, তিনি টাকা চাওয়া ত দূরের কথা, বরং তাহাদের নিমন্ত্রণ করিয়া বলিয়া আসিতেন, আজ আমাদের বাড়ীতে দু'টি প্রসাদ পাস।"

ভগবতী দেবী অতি নিষ্ঠাবতী হিন্দু-রমণী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রাণটি দয়ায় মাখান ছিল। বালবিধবাদের কষ্ট তিনি প্রাণান্তেও সহ্য করিতে পারিতেন না। তাই বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিয়া যখন মাতার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতে গেলেন, তখন তিনি আনন্দিতচিত্তে বলিলেন, "হাঁ বাবা, বড় সঙ্গত প্রস্তাব, দেখ্ যদি হতভাগিনীদের দুঃখের অবসান কোন প্রকারে করিতে পারিস্, এদের দুঃখ আর যে সহ্য হয় না!" বিদ্যাসাগরমহাশয় মায়ের অনুমতিলাভ করিয়া বিধবা বিবাহ দিবার জন্য প্রবৃত্ত হইলেন।

বিদ্যাসাগরমহাশয় বিধবা বিবাহ দিতে প্রবৃত্ত হইলে গ্রামবাসিগণ তাঁহাদের উপর নানা অত্যাচার আরম্ভ করে। এই সংবাদ মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ণ-গোচর হইবামাত্র তিনি তাঁহাদের বাটীতে আসিয়া ঠাকুরদাসকে বলেন, "কোন্ কোন্ লোকে আপনাদের উপর অত্যাচার করে বলুন, তাহাদের এখনই অভিযুক্ত করিব।" ভগবতী দেবী এই সংবাদ শুনিয়া ঠাকুরদাসকে অন্দরে ডাকিয়া আনিয়া বলেন, "তুমি

বল কোন লোকেই আমাদের উপর অত্যাচার করে না।" হাকিমের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও ভগবতী দেবী ও ঠাকুরদাস কেহই গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিলেন না।

আলি-জননী বাঈ আম্মা

মৌলানা মহম্মদ আলি ও সৌকত আলির জননী বনিয়াদি মুসলমান ঘরের ঘরণী, শিক্ষিত মুসলমান জননায়কের জননী হইয়াও বাঈ আম্মা মুসলমান সমাজের অবরোধ-প্রথা মানেন নাই। তিনি শেষ জীবনে প্রত্যেক সভা-সমিতিতে যোগদান করিয়া তাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশের দ্বারা দেশবাসীকে স্বদেশী সাধনায় অগ্রসর হইবার জন্য অনুরোধ করিতেন। আজ যে স্বদেশী সাধনাক্ষেত্রে আমরা দুই চারিটি মুসলমান মহিলাকে যোগদান করিতে দেখিতেছি, ইহার মূলে বাঈ আম্মার চেষ্টা নিহিত। বস্তুতঃ তাঁহার ন্যায় একজন বিদুষী, অভিজাত ও সম্ভ্রান্তবংশীয় মুসলমান মহিলা যদি অবরোধ-প্রথার মুখে পদাঘাত করিয়া অবগুণ্ঠন উন্মোচন করতঃ প্রকাশ্য সভাসমিতিতে যোগদান না করিতেন তবে আমরা আজ এই দুই একজন মুসলমান মহিলা কর্ম্মীকেও দেখিতে পাইতাম না।

বাঈ আম্মাই মুসলমান নারীদের মধ্যে এই সত্যটুকু বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, অবরোধ-প্রথার যবনিকা—সমাজের চিরাচরিত কুসংস্কারের মোহজাল ছিন্ন করিয়া যদি মহিলারা স্বদেশী সাধনার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হন, তবে ভারত "যে তিমিরে সেই তিমিরেই" থাকিবে।

মুসলমান সমাজ অবরোধ-প্রথায় হিন্দু সমাজকেও উল্লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছে। সহর ত দূরের কথা, অতি বড় গণ্ডগ্রামেও মুসলমান নারী-দিগকে যে ভাবে অবরোধের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা হয়, যে ভাবে রেলে, ষ্টীমারে তুলিবার সময় মুসলমান মহিলাকে চারিদিকে কাপড় ঘিরিয়া লইয়া যাওয়া হয়, তেমন ধারা অবরোধ-প্রথার কড়াকড়ি হিন্দু-সমাজে নাই। মুসলমান সমাজের মধ্যে অবরোধের কড়াকড়ি দেখানই হইল সম্ভ্রান্ততা দেখাইবার প্রধান উপায়। বাঈ আম্মা মুসলমান সমাজের এই ত্রুটিটুকু লক্ষ্য করিয়া এবং স্বদেশীসাধনায় মহিলারা যোগদান না করিলে এ যজ্ঞ কখনও সুসম্পন্ন হইবে না, এই সত্যটুকু হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিজে প্রকাশ্য সভাসমিতিতে যোগদান করিতে আরম্ভ করেন। খেলাফৎ আন্দোলনের সময় আলিজননী দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া খেলাফৎ ফণ্ডে অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। মৌলানা মহম্মদ আলি ও মৌলানা সৌকত আলির ন্যায় তিনিও মহত্মা গান্ধীর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন।

মহাত্মা গান্ধী আপন ত্যাগ, সংযম, বিশ্বপ্রেমের মহিমায় একাধারে হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের যেরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি পাইতেছেন, এরূপ কোন নেতার ভাগ্যে কখনও হয় নাই। কেন হয় নাই ? এ পর্য্যন্ত যত নেতা রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্বরাজ লাভের জন্য মুসলমানদের সহায়তা আবশ্যক, শুধু এই স্বার্থ-প্রণোদিত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মুসলমানদিগকে সভা-সমিতিতে ডাকিতেন, কিন্তু মহাত্মার মুসলমান-প্রীতি কোন স্বার্থ-সাধনের জন্য নয়। তিনি মুসলমানের ধর্ম্মস্থান খেলাফতের অবমাননা দেখিয়া তাহার প্রতীকারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। শুধু ইস্‌লামের ধর্ম্ম কেন, যদি খ্রীষ্টানের, বৌদ্ধের, পার্শীর ধর্ম্মেরও এইরূপ অবমাননা দেখিতেন, তাহা হইলেও মাহাত্মা তাহার প্রতীকারে আত্মনিয়োগ

করিতেন। কেবল এই বিশ্বপ্রেমটুকুর জন্তই মহাত্মা গান্ধী মুসলমান সমাজের আজ এতটা প্রিয় এবং শুধু এই কারণেই মৌলানা মহম্মদ ও সৌকত আলি তাঁহার একনিষ্ঠ উপাসক এবং শুধু এই কারণেই আলিজননী বাঈ আম্মা মহাত্মাকে "পয়গম্বরে"র মত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন।

মুসলমান সমাজ পৌত্তলিক নহেন, কিন্তু একমাত্র মহাত্মার বেলা তাঁহাদের এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে। মৌলানা মহম্মদ ও সৌকত মহাত্মাকে দেবতার ন্যায় বদ্ধাঞ্জলি হইয়া আরাধনা করিতেছেন, এরূপ সহস্র সহস্র ছবি বাজারে বিক্রীত হইতেছে—মুসলমান সমাজে তাহাতে কোনদিন কেহ আপত্তি করে নাই—এমন কি বাঈ আম্মা ইহাতে আনন্দ প্রকাশ ছাড়া কখনও আপত্তি করেন নাই।

মৌলানা মহম্মদ আলি ও সৌকত আলি দেশসেবার জন্য এই যে অদম্য উৎসাহ, প্রাণের ভিতর এই যে অকপট দেশপ্রেম পাইয়াছেন ইহার মূল উৎস কোথায়? জননী বাঈ আম্মাই এই মূল উৎস। সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে হিমাদ্রির ন্যায় অচল, অটলভাবে বাঈ আম্মা পুত্রদ্বয়কে দেশসেবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার কাছে এই প্রকার উৎসাহ না পাইলে আলি ভ্রাতৃদ্বয় আজ দেশের এত বড় সেবক হইতে পারিতেন কি না সন্দেহ। ভারতবাসী দেশসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিতে পারে না কেন? কে না বুঝে পরাধীনতার জন্যই আজ তাহাদের এই দুঃখ, কষ্ট, অবসাদ, অবমাননা, নির্জীবতা? ভারতবাসী অন্তঃপুরের প্রেরণা পায় না বলিয়াই আজ ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্র তাহারা নিস্তেজ। বাহিরে যে লোক খদ্দর পরিয়া সভায় মুক্তকণ্ঠে, তারস্বরে বক্তৃতা করেন, তাঁহার ঘরে গিয়া দেখিবে মায়ের অঙ্গে, পরিবারের পরিধানে অতি মিহি পাতলা বিলাতি অথবা মিলের কাপড়! পুত্র কি স্বামী যদি কোনরূপ স্বার্থত্যাগ করিয়া দেশসেবার কার্য্যে ব্রতী হইতে

যায় অমনি মা ও স্ত্রী তাহার প্রতিবন্ধক হন। এই কারণেই দেশে দেশসেবকের অত্যন্ত অভাব। দেশের মা-ভগিনীরা যদি দেশের যে কি দুর্দ্দশা তাহা বুঝিতেন তবে আজ দেশের অবস্থা অন্যরূপ হইত। আলি-জননী বাঈ আম্মা কিন্তু এ শ্রেণীর মহিলা ছিলেন না। তিনি ইচ্ছা করিলে পুত্রদ্বয়কে অন্য পথে চালিত করিয়া মহাসুখে "রাজমাতা"র ন্যায় সংসারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু দেশ-জননীর ছিন্ন বসন, রুক্ষ কেশ, কঙ্কালসার দেহ, বুবুক্ষাক্লিষ্ট শূন্য উদর-দর্শনে তাঁহার প্রাণে যে বড় ব্যথা লাগিয়াছিল! তিনি ভাবিয়াছিলেন, কেন, আমি কি কেহ নই? এই বাহু দু'খানি কি দেশের কাজে নিয়োজিত হইবে না? তাই তিনি কুন্তীর ন্যায় নিজের পুত্র দু'টিকে স্বদেশী-সাধনা-আহবে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ধন্য সেই মাতা যে মাতা এইভাবে পুত্রকে দেশের সেবায় উৎসর্গ করিতে পারেন, ধন্য সেই মাতা—যে মাতা হাসিতে হাসিতে পুত্রকে কারাগারে প্রেরণ করিতে পারেন! আজ বাঈ আম্মা লোকলোচনের অন্তরালে গিয়াছেন সত্য, কিন্তু জীবাত্মার অবিনাশিত্বে বিশ্বাসী হিন্দু মনে করিতেছে আবার তিনি তাঁহার অসমাপ্ত যজ্ঞে আহুতি দিবার জন্য অন্য ভাবে, অন্য আকারে জন্মগ্রহণ করিয়া আরও বীর সন্তান প্রসব করিবেন। ভারতের আকাশে, বাতাসে সর্ব্বত্র তাঁহার সাধনার ঝঙ্কার ঝঙ্কৃত হইবে, শত শত মহিলা তাঁহার জীবন-কথা স্মরণ করিয়া স্বদেশ-সেবায় অবতীর্ণা হইবেন।

বাঈ আম্মা কি ছিলেন? তিনি কি ছিলেন—তাঁহাকে যাঁহারা না দেখিয়াছেন সে ধারণা তাঁহারা করিতে পারিবেন না। তিনি একটা মূর্ত্তিমতী তেজ, প্রীতি, মৈত্রী ও ভালবাসার প্রতীক ছিলেন। করাচীর মামলায় যখন আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের কঠোর কারাদণ্ড হয়, তখন তিনি সেই শক্তিশেল বুকে লইয়া ভারতে সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছিলেন—

"ভারতবাসী, যদি বাঁচিতে চাও, যদি জীবন-সংগ্রামের দিনে নিজের প্রাণ বাঁচাইতে চাও তবে স্বরাজ-লাভে মহাত্মার অহিংস অসহযোগনীতি অবলম্বন কর।" বৃদ্ধার কণ্ঠের সে অসীম তেজস্বিনী বাণী এখনও যেন কাণের ভিতর ঝঙ্কৃত হইতেছে। এরূপ তেজস্বিনী মা না হইলে কি এমন তেজস্বী পুত্র-প্রসবিনী হইতে পারেন? শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, আতপতাপ নাই, বৃদ্ধা বাঈ আম্মা ভারতের সর্ব্বত্র স্বদেশী মন্ত্র প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন। দুঃখ হয়, তিনি জীবিত থাকিতে কেন সহস্র সহস্র মুসলমান মহিলা অবরোধের নিগড় ভাঙ্গিয়া চূরমার করিয়া আসিয়া তাঁহার সাহচর্য্য করিল না! নব্যতুরস্ক আজ এই অবরোধ-প্রথাকে দূর করিয়াছে, ভারতের মুসলমান সমাজ কি এখনও নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিবেন না? বাঈ আম্মা কিন্তু এই সত্যটা বুঝিয়াছিলেন। ভারতে রাণাড়ে, গোখেল, সুরেন্দ্র, ভূপেন্দ্র প্রভৃতি কত নেতার উদ্ভব হইয়াছে, কিন্তু কাহারও "মা" এরূপ ভাবে পুত্রকে স্বদেশী-সাধনার মন্ত্রে দীক্ষিত করেন নাই! মনে পড়ে, যশোহরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুরের অশীতিপর বৃদ্ধা মাতাকে দেখিয়াছিলাম হর্ষগদগদকণ্ঠে সমাগত প্রতিনিধিগণকে সম্বর্দ্ধনা করিতে! তারপর এক বাঈ আম্মা ছাড়া আর কাহাকেও সভা-সমিতিতে দেখি নাই।

মৌলানা মহম্মদ আলি ও মৌলানা সৌকত আলি একবার চিন্দ-ওয়ারার মামলায় আর একবার করাচীর মামলায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই দুইবারই তিনি পুত্রদ্বয়কে হাসিতে হাসিতে কারাগারে পাঠাইয়া দেন। আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের জনকের—অর্থাৎ বাঈ আম্মার স্বামীর যখন মৃত্যু হয় তখন বাঈ আম্মার বয়স মাত্র ২৭ বৎসর, সে ১৮৮০ সালের কথা। তাঁহাকে ছয়টি সন্তান-সন্ততির লালন-পালনের ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তিনি প্রাণপণ যত্নে পুত্র-কন্যাগণকে লালন পালন

করেন। ইংরাজী স্কুলে মুসলমান বালকদিগকে অধ্যয়নার্থ প্রেরণ করা কোরাণ শরিফের বিরুদ্ধ হইলেও তিনি মহম্মদ ও সৌকতকে প্রথমে বেরিলি ও পরে আলিগড় কলেজে প্রেরণ করেন।

১৯২১ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর লাহোরে একটি বিরাট সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন—"আজ আমি আমার মাথার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়াছি। আমি মনে করি সভায় যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই আমার মহম্মদ ও সৌকতের ন্যায় পুত্র-সদৃশ। তাঁহারা যেন একমাত্র খোদা ভিন্ন অন্য কাহাকেও ভয় না করেন, ফাঁসী কাষ্ঠ, কারাগার—এ সমস্তই তুচ্ছ পদার্থ; আমি দেশের জন্য মরিতে, কারাদণ্ড ভোগ করিতে ও সংসারে যত প্রকার মানুষিক দণ্ড আছে তাহা ভোগ করিতে প্রস্তুত আছি। সকলে আপনারা খদ্দর পরিধান করুন এবং এবং মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা মন্ত্রে দৃঢ়চিত্ত থাকুন।"

সেই সভার তিন দিন পরে করাচীর একটি সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বাঈ আম্মা বলেন,—"দেশবাসী সকলেই আমার পুত্র ও ভ্রাতৃস্থানীয় বলিয়া আমি আজ তিন দিন হইল অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়াছি। আমার দুই পুত্র কারাগারে গিয়াছে, আমি সেজন্য একটুও দুঃখিত নহি, আপনারা সকলে আমার পুত্র-দ্বয়ের অসমাপ্ত কার্য্য সমাপ্ত করুন। আমরা সংখ্যায় ৩৩ কোটি ভারতবাসী,সরকার আমাদের কত জনকে কারাগারে দিবে? আমি তোমাদের সহিত কারাবরণ করিতে প্রস্তুত আছি। খোদা ছাড়া কোন মানুষে মানুষের প্রাণ লইতে পারে না। ভগবান ছাড়া আর কাহাকেও ভয় করিও না। সরকারের সহিত অসহযোগিতা কর। আমি হিন্দু-মুসলমানে কোন পার্থক্য দেখিতে পাই না। আমি কাহাকেও হিংসার পথ অবলম্বন করিতে বলিতেছি না,তবে এ কথাও বলি, খোদা ভিন্ন অন্য কাহাকেও ভয় করিও না। তোমাদের ভিতর ন্যায্য ও অন্যায্য বলিয়া দুইটি শক্তি আছে। যাহা ন্যায্য তাহার জন্য প্রাণপণ

চেষ্টা করিতে পশ্চাৎপদ হইও না। তোমরা খদ্দর পরিধান কর না কেন? পূর্ব্বকালে কি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মোটা কাপড় পরেন নাই? তাহাই যদি হয়, তবে স্থূল বসন পরিধান করিতে তোমাদের এত আপত্তি কেন?"

বাঈ আম্মা একদিকে যেমন ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বীর কোরাণ শরিফে অগাধ বিশ্বাসী এবং ব্যুৎপন্ন ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি আমাদের হিন্দু শাস্ত্রেও পারদর্শিনী ছিলেন। কলিকাতায় একটি সভায় বক্তৃতা করিবার প্রসঙ্গে তিনি গীতার একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। রামায়ণ মহাভারতের অনেক ঘটনার তিনি প্রায়ই উল্লেখ করিতেন। "আমার পুত্র দুইটিকে আমি দেশের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছি"—ইহাই ছিল তাঁহার মূলমন্ত্র। সিন্ধু যেমন নিজের বক্ষ শীর্ণ করিয়া নদীসকলকে সুমিষ্ট বারিদানে পরিবর্দ্ধিত করে, বাঈ আম্মাও তেমনি তাঁহার হৃদয়ের যা' কিছু স্নেহ-প্রীতির পীযূষধারা তাহা দিয়া আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে স্বদেশী মন্ত্রে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন।